দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

স্বামীজী ও নেতাজীর জীবনাদর্শের প্রেক্ষিতে শিক্ষক সমাজের কর্তব্য
— পৃঃ ২৪

কর্তব্যবোধ ও শাশ্বত জীবনমূল্যের সন্ধানে
— পৃঃ ১১

৭৬ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা।। ১৫ জানুয়ারি, ২০২৪।। ২৯ পৌষ, ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**
E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৬ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, ২৯ পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

১৫ জানুয়ারি - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

‘যোগী মডেলেই মুক্ত হবে পশ্চিমবঙ্গ’ —মমতা বিষ ওগরাতেই হবে ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

ঘরের শত্রু ভাইপো ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

চিকিৎসকদের পারস্পরিক মতবিনিময়ে স্বাস্থ্যব্যবস্থা আরও মজবুত হবে ☐ ই এস কৃষ্ণমূর্তি এবং বি এন গঙ্গাধর ☐ ৮

বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার জন্য দ্রুত এগোচ্ছে ভারত ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

কর্তব্যবোধ এবং শাশ্বত জীবনমূল্যের সন্ধানে ☐ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ☐ ১১

রামমন্দির নতুন ভারতে কর্তব্যবোধের প্রেরণা জোগাবে ☐ সাধন কুমার পাল ☐ ১৪

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে জীবনব্রতের আদর্শ শিক্ষক ☐ দীপক খাঁ ☐ ১৮

পশ্চিমবঙ্গে বিকল্প শিক্ষক আন্দোলনের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন ☐ বাপী প্রামাণিক ☐ ২৩

স্বামীজী ও নেতাজীর জীবনাদর্শের প্রেক্ষিতে শিক্ষক সমাজের কর্তব্য ☐ তারাশঙ্কর চক্রবর্তী ☐ ২৪

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের জাগরণ কর্মসূচি ☐ ২৮

মকর সংক্রান্তি উৎসব ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধ ☐ পিন্টু সান্যাল ☐ ৩১

‘হিন্দ কা চাদর’ গুরু তেগবাহাদুর ☐ কানুরঞ্জন দেবনাথ ☐ ৩৪

নারী শিক্ষা বিস্তারে নারীর ভূমিকা ও বর্তমান প্রেক্ষাপটে তার কর্তব্য ☐ নিবেদিতা গুপ্ত সাহা ☐ ৩৬

সন্দেশখালিতে আক্রান্ত ইডি— এটাই কি পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন? ☐ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ☐ ৩৭

হিমালয় অঞ্চলের উন্নয়ন যেন দূষণে গিয়ে না ঠেকে ☐ গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ৪৩

সেজে উঠেছে গঙ্গাসাগর মেলা ☐ হীরক কর ☐ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ অন্যরকম : ৩৯ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৪৭ ☐ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৫০

ফ ঃ ১

প্রকাশিত হবে
২২ জানুয়ারি,
২০২৪

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ভারতীয় গণতন্ত্র

প্রকাশিত হবে
২২ জানুয়ারি,
২০২৪

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশ স্বাধীনতা লাভ করলেও ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি দেশের সংবিধান ভারতীয় গণপরিষদে কার্যকর হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে সেই দিন থেকে ভারত সার্বভৌম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবেন ড. পৃথাপণ্ডিত রায়চৌধুরী, বিমল শঙ্কর নন্দ, নন্দলাল ভট্টাচার্য, বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী, ড. কল্যাণ চক্রবর্তী প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কর্তব্যবোধ

ভারতবর্ষে কর্তব্যবোধ বা দায়িত্ব জ্ঞানকে কখনো কখনো ধর্ম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পিতৃধর্ম, পুত্রধর্ম, স্ত্রীধর্ম, স্বামীধর্ম, ক্ষত্রিয়ধর্ম, রাজধর্ম ইত্যাদি শব্দবন্ধ সেই কারণেই প্রযোজ্য হইয়া থাকে। এই কর্তব্যবোধের পাঠ আচার্য অথবা শিক্ষকের নিকট হইতে গ্রহণ করা হয়। প্রাচীন ভারতে জ্ঞানতপস্বী আচার্যগণ শিক্ষাদান কর্মে ব্যাপৃত থাকিতেন। গৌতম বুদ্ধ উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে জীবনের পথপ্রদর্শন করিতেন। তক্ষশিলার আচার্য বিষ্ণুগুপ্ত শিক্ষাদানের মাধ্যমে এক সাধারণ বালককে চক্রবর্তী সম্রাটে উন্নীত করিয়াছিলেন। শিক্ষাদান তাঁহাদের কর্তব্যবোধ দ্বারা চালিত হইত। ভারতবর্ষে শিক্ষাদানকে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলিয়া মনে করা হইত। ভারতবর্ষে কোনোকালেই শিক্ষাদানকে পেশা হিসাবে গণ্য করা হয় নাই, গণ্য হইত ব্রত হিসাবে। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে শিক্ষাদান করিয়া আচার্যগণ কোনোপ্রকার পারিশ্রামিক গ্রহণ করিতেন না। পঞ্চতন্ত্রের আচার্য বিষ্ণুশর্মার প্রসিদ্ধ উক্তি 'নাহং বিদ্যা বিক্রয়ং করোমি' আচার্যকুল পাথেয় হিসাবে স্মরণে রাখিতেন। প্রাচীন আচার্যকুলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আধুনিককালের শিক্ষকগণও শিক্ষাদানকে ব্রত মনে করিতেন। পূর্বে ভারতবর্ষে শিক্ষাব্যবস্থা রাজানুগ্রহ পোষিত ছিল না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বয়ংশাসিত একক হিসাবে পরিচালিত হইত। সেই কারণেই ব্রিটিশ এই দেশে আসিবার পূর্বে শিক্ষার মানদণ্ডে ভারত ব্রিটেনের চাইতেও উচ্চস্থানে অবস্থান করিত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং তাহার পর ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ধ্বংসসাধন করিয়া শুধুমাত্র করণিক তৈয়ারি করিয়াছে। দুঃখের বিষয়, দেশ স্বাধীন হইবার পর দেশের সরকার ইতিবাচক জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করিতে পারে নাই। তাহার ফলে শিক্ষক সমাজের জাতি গঠনের কাজটি সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হইয়াছে। বাম দলগুলি শিক্ষক সমাজকে দলদাসে পরিণত করিয়াছে। শিক্ষককুলের একাংশ শিক্ষাদানকে অর্থাগমের ক্ষেত্রস্বরূপ মনে করিয়াছেন। শিক্ষক সংগঠনগুলি এক-একটি রাজনৈতিক দলের অনুষঙ্গ হিসাবে কাজ করিয়াছে এবং অদ্যাবধি করিতেছে। বিদ্যাদান অপেক্ষা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেই তাহাদের অধিক অভিরুচি। সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতাসীন করাই তাহাদের লক্ষ্য; বিদ্যাদান উপলক্ষ্য মাত্র। ইহার ফলেই দেশবাসী বিশেষত বাঙ্গালি মেরুদণ্ডহীন জাতিতে পরিণত হইয়াছে। আর সেই কারণেই স্বাধীনতার কয়েক দশক পর্যন্ত দেশ উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। কিন্তু ইহার মধ্যেও একদল রাষ্ট্রবাদী শিক্ষক শিক্ষাদানকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়া জাতিগঠনের কার্যে নিয়োজিত রহিয়াছেন। রাষ্ট্রবাদী শিক্ষকগণ একটি বিকল্প সংগঠন নির্মাণ করিয়া শিক্ষক সমাজকে সতত কর্তব্যবোধের বার্তা প্রদান করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন হইতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন পর্যন্ত কালখণ্ডকে তাহারা 'কর্তব্যবোধ দিবস' রূপে পালন করিয়া শিক্ষক সমাজকে তাহাদের ব্রতের কথা স্মরণ করাইতেছেন। রাষ্ট্রবাদী শিক্ষকগণ 'অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ' নামক সংগঠনের ছত্রতলে সংগঠিত হইয়া শিক্ষক সমাজের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের সর্ববিধ প্রচেষ্টাও করিয়া চলিয়াছেন।

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ দেশের শিক্ষক সমাজকে তাহাদের কর্তব্যের বিষয়ে অবগত করাইলেও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষকদের অবস্থা সুখের নহে। বর্তমান ভারত সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ প্রণয়ন করিলেও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার তাহা রাজ্যে প্রয়োগ করিতে রাজি নহে। বিগত চৌত্রিশ বৎসরের কমিউনিস্ট শাসনে এবং তৎপশ্চাৎ বর্তমান শাসকদলের দিশাহীন প্রশাসন পরিচালনায় আজ পশ্চিমবঙ্গে সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটিয়াছে। শিক্ষাব্যবস্থায় তাহারা সমস্ত প্রকারের দলতন্ত্র কায়েম করিয়াছে। রাজ্যে সরকারের শিক্ষামন্ত্রী-সহ শিক্ষাদপ্তরের কর্তাব্যক্তিরা শিক্ষাসংক্রান্ত দুর্নীতির দায়ে কারান্তরালে রহিয়াছেন। তাঁহারা যোগ্য শিক্ষক প্রার্থীদের চাকুরি চুরি করিয়া বৃহৎ অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে অযোগ্য ব্যক্তিবর্গকে শিক্ষক পদে নিয়োগ করিয়াছেন। স্বয়ংশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যাভারতী এবং বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদ পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিকেও তাহারা ব্যতিব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। দুর্নীতির অনুসন্ধানে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদিগের তদন্তকার্যে শুধু বাধা সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত থাকেননি, তাহাদিগকে প্রাণে মারিবার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। এককথায়, তাহারা সমগ্র রাজ্যে এক নৈরাজ্যের রাজত্ব কায়েম করিয়াছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও সুখের বিষয় হইল, নানাপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও রাষ্ট্রবাদী শিক্ষক সংগঠনের জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সংগঠনটি দেশের বৃহত্তম শিক্ষক সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রাষ্ট্রবাদী, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ আশা করিতেছেন, পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্র-সহ সমস্ত অরাজকতার শীঘ্রই অবসান ঘটিবে। শিক্ষককুল তথা বাঙ্গালি পুনরায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হইবেন।

সুভাষিতম্

শুচিত্বং ত্যাগিতা শৌর্যং সামান্যং সুখদুঃখয়োঃ।
দাক্ষিণ্যং চানুরক্তিশ্চ সত্যতা চ সুহৃদ্‌গুণাঃ।।

মনের নির্মলতা, ত্যাগভাবনা, সাহসী, সুখ-দুঃখে সমভাব, বুদ্ধিমত্তা, অনুরাগ ও সত্যতা— এসবই মিত্রের গুণ।

‘যোগী মডেলেই মুক্ত হবে পশ্চিমবঙ্গ’

মমতা বিষ ওগরাতেই হবে

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

সাপকে দুধ খাওয়ালে তার বিষ বাড়ে। ২০১৬ থেকে লোকসভা আর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে এগিয়ে রেখে মমতা-বিষ পান করেছে রাজ্যের মানুষ। স্বেচ্ছায় সে বিষ পানের ফলে রাজ্যজুড়ে তৈরি হয়েছে দুষ্কৃতী মুক্তাঞ্চল। সমাজবিরোধী আর দুস্কৃতী দমনে সফলতার মডেল খাড়া করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি দেখিয়েছেন দুষ্কৃতীরা কেন বুলেটের ভাষাটাই বোঝে। পরিসংখ্যান বলছে রেকর্ড, দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর আনুমানিক দু'হাজার দুষ্কৃতীকে নিকেশ করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। কিছু দেশবিরোধী জিহাদি, বামপন্থী দল আর কয়েকজন বিজাতীয় কংগ্রেস নেতা যোগীকে ‘ট্রিগার হ্যাপি’ আর ‘বুল ডোজার জনক’ বলে সমালোচনা করলেও শেষ পর্যন্ত চুপ মেরে গিয়েছেন। মানুষের আশীর্বাদের ঢল দেখে তারা গুটিয়ে গিয়েছে।

যোগীর মতো কলিজায় জোর বা সাহস মমতার নেই। কারণ মমতা তাদের পালনপোষণ করেন। তাদের নিয়ে তুষ্টীকরণের রাজনীতি করেন। নাম কিনেছেন তুষ্টিরানি। যে মুসলমানদের নিয়ে মমতা রাজনীতি করেন তিনি তাদের বোঝাতে চান না যে তাঁরা এ দেশের মানুষ। তাতে মমতার অসুবিধা। তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের জাগরণের সুবিধা পেয়ে যেতে পারে পরাক্রমী বিজেপি। সংখ্যালঘুরা পুরোমাত্রায় ভারতীয় আর ভারতবাসী। তাদের ‘পিতৃ-মাতৃভূমি’ ভারত। তাদের ‘উপাসনা পদ্ধতি’ আলাদা হতেই পারে। মমতা এর কতটা নিজে বোঝেন তা নিয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে। আর যদি বুঝেও থাকেন তা ব্যবহার করতে চান না। তাদের ভোটার হিসেবে ব্যবহার করতেই মমতা বেশি আগ্রহী। তবে আমার ধারণা আসন্ন লোকসভা ভোটে সে পাশার দান উলটে যাবে।

বিদেশি বামেরা ওই সম্প্রদায়কে নিয়ে একসময় পাশা খেলেছিলেন। ৩৪ বছর ধরে রাজ্যের মানুষ বাতিল হয়ে যাওয়া বিদেশি ওই তত্ত্বের অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন। আজ বিদেশি বামেদের সভায় জাতীয় পতাকা উড়তে দেখলে হাসি পায়। একসময় এরাই ‘ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়’ বলে ভারতের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করেছিল। অসহায় শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছিল। বাতিল হয়ে গিয়ে পিঠ বাঁচাতে ভারতের জাতীয় পতাকা হাতে নিয়েছে। মমতা এই বিদেশিদের পাশা উলটে দিয়েছিলেন। মমতার পাশা তাঁর ভোটদানীরাই এবার উলটে দেবে। মমতার দলে দুর্নীতির চাক বেড়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। সেই চাকে ঢিল মেরেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। শুনছি কিছুদিনের মধ্যেই সে ঢিল অভিষেকবাবু গায়েও লাগবে। তাতেই আগে ভাগে আক্রমণ চালু করেছে মমতার ভিমরুলরা।

> **দল আর পরিবার বাঁচাতে দুর্নীতির নৌকায় ভেসেছেন মমতা। দলের মধ্যে চক্রান্ত বলে দুর্নীতি আর চুরি পালটা ভাষা তৈরি করেছেন মমতা। তাতেই জেগে উঠেছে দলের দুর্নীতিবাজরা।**

সন্দেশখালিতে ইডি অফিসারদের মেরে ফেলার চেষ্টা তার বড়ো উদাহরণ। দলের অন্দরে শুনেছি তৃণমূলকর্মী আর সমর্থকদের কাছে বার্তা গিয়েছে লোকসভা ভোট পর্যন্ত যে করে হোক কেন্দ্রীয় তদন্তকে আটকে রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির মধ্যে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করে ইডি আর সিবিআই অফিসারদের কাজ করতে দেওয়া হবে না। গণপ্রতিরোধের নামে প্রতিটি জেলায় কেন্দ্রীয় এজেন্সি প্রতিরোধ কমিটি বানানোর সুপারিশও করা হয়েছে। বলা হয়েছে কোনো তৃণমূল নেতার বাড়িতে যেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা ঢুকতে না পারেন। তার জন্য তৃণমূলের মদতে বেড়ে ওঠা স্থানীয় মানুষের আর সমাজবিরোধী দুষ্কৃতীদের ব্যবহার করতে হবে।

সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়ির নীচে সেই প্রতিরোধ বাহিনী আগেই তৈরি হয়েছে। তাকে গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা তৈরি হলে তারা প্রথম ব্যারিকেড তৈরি করবে। তার অন্য একটি বাড়িতে পুলিশ পাহারা বসিয়ে রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেকেই দুর্নীতির রানি ‘ঘোটালা দিদি’ বলেন। দল আর পরিবার বাঁচাতে দুর্নীতির নৌকায় ভেসেছেন মমতা। দলের মধ্যে চক্রান্ত বলে দুর্নীতি আর চুরি পালটা ভাষা তৈরি করেছেন মমতা। তাতেই জেগে উঠেছে দলের দুর্নীতিবাজরা।

২০১৩ থেকে এই রাজ্যের মানুষ গরল পান করে চলেছেন। বিষনীল রাজ্যের দেহ থেকে সে বিষ নামানো বা ঝাড়ার সময় আগত। এখন শুধু দেখার সে রকম ‘ওঝা’ তৈরি হয়েছে কি না। □

ঘরের শত্রু ভাইপো

বিপন্নেষু দিদি,

আপনি মুখে স্বীকার করুন না আর না করুন আপনার অনুগত ভাই হিসেবে আমি জানি বড়োই বিপন্ন অবস্থা আপনার। 'ঘরের শত্রু ভাইপো' আপনাকে উত্যক্ত করে রেখেছেন। প্রথমত, আপনি যখন দলের প্রবীণদের ধরে রাখতে চাইছেন তখন তিনি স্পষ্টই বলে দিচ্ছেন আপনার অবসর নেওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। এটা সত্যিই দিদি বিপন্ন হওয়ার মতোই অবস্থা।

গত ৭ তারিখ ভাইপোমশাই নিজের কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে যা করেছেন এবং বলেছেন তাতে বিরোধীদের নয়, বিপদ আপনার। প্রথমত, তিনি বলেছেন, 'বয়স হলে কর্মক্ষমতা কমে যায়, এটা ধ্রুবসত্য।' আর আপনি তার জবাব দিতে ৮ জানুয়ারি গঙ্গাসাগর থেকে বলেছেন 'আমরা যোগ্য লোকদের ৬০ বছরে বিদায় দিই না। আমরা তাঁদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাই।'

এর থেকে বড়ো শত্রুতা দিদি তাঁর অন্য একটি ঘোষণা। তিনি জানুয়ারি মাস থেকে নিজের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারের প্রবীণদের জন্য বার্ধক্যভাতা প্রকল্প চালু করেছেন। প্রথম দফায় ৭ তারিখই বিষ্ণুপুর এলাকায় চেক তুলে দিয়েছেন সাংসদ। বিরোধীরা বলছে, 'চুরির টাকা বিলি হচ্ছে'। সেটা তো বলতেই পারে। কারণ, এই টাকার উৎস নিয়ে ভাইপোশ্রী গোলগোল কথা বলেছেন।

সর্বশেষে 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচিতে যাঁরা বার্ধক্য ভাতার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন তাঁদের এখনও পর্যন্ত টাকা দেওয়া শুরু করেনি দিদি আপনার সরকার। কারণ, টাকা নেই। আর ভাইপো জানিয়ে দেন, পিসি না পারলেও তিনি পারেন। নিজের লোকসভা এলাকার প্রবীণদের মাসে মাসে এক হাজার টাকা করে দেবেন। সেই টাকা রাজ্য সরকারের, তৃণমূলের, না কী তাঁর ব্যক্তিগত, সে ব্যাপারে কিছুই বলেননি তিনি। তবে জানিয়েছেন, এক বার নয়, প্রতি মাসেই মিলবে টাকা। তবে যা হিসাব তিনি দিয়েছেন, তাতে সকলকে টাকা দেওয়া হলে মাসিক খরচ দাঁড়াবে ৭ কোটি ৬১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা।

দিদি, অতীতে কিন্তু রাজ্যে কোনও সাংসদই এমন উদ্যোগ নেননি। বিরোধী দলের তো নয়, আপনার অনুগতরাও নয়। সবাই আপনার উপরে ভরসা রেখেছেন। আর নিজের ভাইপো পিসিকে ছোটো করে নিজেই টাকা বিলি শুরু করে দিলেন। এমনকী এটাও বলেছেন যে, আগামীদিনে তাঁর দেখানো পথ গোটা বাংলায় চালু হতে পারে। ভাইপো বলেন, 'আমি মনে করি, এই মানুষগুলোর মুখে হাসি ফোটানো জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব।' সাংসদ ভাইপো জানান, গত দু' মাস ধরে কীভাবে ডায়মন্ড হারবার ঘুরে ঘুরে ৭৬ হাজার ১২০ জন বয়স্ক মানুষের রেজিস্ট্রেশন করানো হয়েছে। ১৬,৩৮০ জন স্বেচ্ছাসেবক চার-পাঁচ জন করে দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁদের মাধ্যমে প্রায় ৬০ হাজার মানুষকে মাসে মাসে হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে। বার্ধক্য ভাতার পর এবার ১০০ দিনের কাজের টাকা দেওয়ারও চিন্তাভাবনা করছেন তিনি।

ভাবা যায়! কত বড়ো আস্পর্ধা ভাইপোর! বলে কি না পিসির উপরে ভরসা রাখার দরকার নেই, আমিই সব টাকা দিয়ে দেব।

সাংসদের কথায়, '৬৬ হাজার লোক রয়েছেন ডায়মন্ড হারবারে যাঁরা ১০০ দিনের কাজ করে টাকা পায়নি। এক-দু মাসের মধ্যে ব্যবস্থা না হলে সেটাও আমি ডায়মন্ড হারবার দিয়ে শুরু করব।' ভাবা যায় দিদি? ভাবা যায়! কত বড়ো আস্পর্ধা! বলে কি না পিসির উপরে ভরসা রাখার দরকার নেই, আমিই সব টাকা দিয়ে দেব।

আপাতত ৬০ হাজার প্রবীণকে এই ভাতা দেওয়া হবে বলে অভিষেক জানালেও মোট ৭৬,১২০ জনের হিসাবই দিয়েছেন ভাইপো। মাথাপিছু মাসে এক হাজার টাকা করে ধরে এই প্রকল্পে মাসে ৭,৬১,২০,০০০ টাকা খচ হবে। শোনা যাচ্ছে ভাইপোর অর্থ সংগ্রহের পদ্ধতি অন্যরকম। তিনি শুধু ১৬,৩৮০ জন বড়ো মনের স্বেচ্ছাসেবক বা দাতা খুঁজে বের করেননি সেই সঙ্গে তাঁদের এটা বোঝাতে পেরেছেন যে মাসে মাসে প্রত্যেককে তাঁর ব্যক্তিগত বার্ধক্য ভাতা প্রকল্পের জন্য চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে। সেটাও অনির্দিষ্টকালের জন্য।

আচ্ছা দিদি, ভাইপোকে একবার জিজ্ঞেস করবেন ওই টাকা যাঁরা দেবেন তাঁরা বিনিময়ে কী নেবেন? অতীতে যা নিতেন সেটাই তো! মানে কাটমানি। না কি, ভাইপোর কালোটাকা অন্যের নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে। রহস্য। অনেক রহস্য দিদি। সে সব নিয়ে আমার ভাবনা নেই। আমি ভাবছি 'পিসি সরকার' আর 'ভাইপো সরকার' লড়াইটা কতদূর যাবে! □

অতিথি কলম

চিকিৎসকদের পারস্পরিক মতবিনিময়ে স্বাস্থ্যব্যবস্থা আরও মজবুত হবে

ই.এস. কৃষ্ণমূর্তি এবং বি.এন. গঙ্গাধর

ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন সংক্রান্ত আরও বিশদ গবেষণার প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে পরম্পরাগত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুবৃহৎ ধনভাণ্ডারের অধিকারী দেশ ভারত নেতৃত্বদানের মাধ্যমে ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিনের গবেষণায় ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় এক অগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ভারতীয় পরম্পরায় বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতিগত জ্ঞানভাণ্ডার বিদ্যমান। যদিও অনেকেই এই প্রজ্ঞার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান, অনেকের কাছে তা উপহাসের বিষয়। দেশীয়, পরম্পরাগত স্বাস্থ্য পরিষেবা কীভাবে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে পরিণত হচ্ছে এবং দেশ ও সমাজ গঠনের প্রয়োজনে দ্রুততার সঙ্গে সেই রূপান্তরগত প্রয়োগের বিষয়ে আজ এই প্রসঙ্গের অবতারণা। পরম্পরাগত ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমন্বয়ে নির্মিত এই 'ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন' নামক চিকিৎসাবিদ্যা হতে চলেছে স্বাস্থ্য পরিষেবার ভবিষ্যৎ যা সৃষ্টি করতে চলেছে এই সংক্রান্ত গবেষণার সুযোগ।

আধ্যাত্মিক দিক : সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের নীতিটি যেমন ভাবে সর্ব স্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত, তেমনই 'সম্পূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থতা-স্বাভাবিকতা হলো স্বাস্থ্য'— স্বাস্থ্যের এই সংজ্ঞাটিও সর্বাঙ্গীণ। ব্যক্তিস্তরে এই নীতিগত ভারসাম্যের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার মাত্রা যুক্ত হলে, এহেন সাম্যাবস্থা রক্ষায় তা এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

অসংক্রামক ব্যাধিসমূহ : অসংখ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত যে বিকল্প হিসেবে দেশীয় ভেষজ ঔষধ ও ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিপূরক হয়ে উঠতে সক্ষম। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের চিকিৎসক সমাজের এই উদ্দেশ্যে সম্মিলিত ভাবে নীরবতা, নিস্তব্ধতা ভেঙে এখন রোগাক্রান্তদের পাশে দাঁড়ানোর বিশেষ প্রয়োজন। দেশীয় পরম্পরাগত চিকিৎসা ব্যবস্থা হতে আধুনিক বায়ো-মেডিসিন বা অ্যালোপ্যাথি নামক চিকিৎসা প্রণালীর পৃথকীকরণ আজ সম্পূর্ণ। দুইটি চিকিৎসা পদ্ধতিকে একত্রে 'কমপ্লিমেন্টারি অ্যান্ড অল্টারনেটিভ মেডিসিন' (পরিপূরক ও বিকল্প চিকিৎসা) বলেও অভিহিত করা হচ্ছে। আধুনিক বায়ো-মেডিসিন নির্ভর চিকিৎসা প্রণালীর একটি বিশেষ সীমাবদ্ধতা ইদানীং প্রকট হয়ে উঠেছে। 'নন-কমিউনিকেবল্ ডিজিজেস/এনসিডি' (অসংক্রামক ব্যধি) হিসেবে পরিচিত— ক্রনিক ও লাইফস্টাইল ডিজিজেস (দীর্ঘস্থায়ী ও জীবনশৈলীজাত রোগব্যাধি)-এর প্রতিরোধ ও নিরাময়ে এই অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা পুরোপুরি সফল নয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র পরিসংখ্যান অনুযায়ী, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজেস (নানা ধরনের হৃদরোগ), ক্রনিক রেসপিরেটরি ডিজিজেস (শ্বাসযন্ত্রঘটিত দীর্ঘমেয়াদি রোগ) ও ডায়াবেটিস (মধুমেহ)-এর মতো এনসিডি গোত্রের রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বিশ্বে প্রতি বছর ১ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারান, যাদের ৮৬ শতাংশ নিম্ন ও মধ্যম আয় সম্পন্ন দেশসমূহের বাসিন্দা। বিশ্বে প্রতি ৮ জনের মধ্যে একজন ব্যক্তি— কোনো একটি মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত, যা এনসিডি-র এক ভিন্ন প্রকারের উদাহরণ।

রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধে সার্বিক পদক্ষেপ : সর্বত্র রোগ প্রতিরোধী ও রোগ-ব্যাধি বিষয়ে সচেতনতামূলক জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা বা 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষত এনসিডি আক্রান্তদের ক্ষেত্রে আধুনিক বায়ো-মেডিসিন নির্ভর চিকিৎসা পদ্ধতিও— খাদ্যাভ্যাসগত পরিবর্তন (diet), ব্যায়াম / শরীরচর্চা (exercise) ও জীবনশৈলীগত পরিবর্তন (lifestyle practices)-এর পরামর্শ দিচ্ছে, যা পৃথিবী জুড়ে একদা বিকশিত— আয়ুর্বেদ, যোগ ও ধ্যানমূলক মননশীলতার মতো প্রাচীন, পরম্পরাগত স্বাস্থ্য পরিষেবায় ইতিমধ্যেই সম্পৃক্ত ও উপ্ত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রিক

‘দ্য ন্যাশনাল সেন্টার ফর কমপ্লিমেন্টারি অ্যান্ড ইন্টিগ্রেটিভ হেলথ্’-এর নির্ধারিত সংজ্ঞা অনুযায়ী— সুস্বাস্থ্য ও সামগ্রিক সুস্থতার লক্ষ্যে ‘ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন’ (আই.এম) একটি সার্বিক পদক্ষেপ যা বহুল প্রচলিত / কনভেনশনাল (মডার্ন) মেডিসিন ও পরম্পরাগত / কমপ্লিমেন্টারি (ট্র্যাডিশনাল) মেডিসিনের সমবায়ে সমন্বিত।

সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা : ইদানীং একটি বিষয়ে অনেকেই বিশেষ সচেতন। রোগাক্রান্তদের প্রয়োজন অনুযায়ী এবং তাদের সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা যেন হয়ে ওঠে সন্তোষজনক, তাতে যেন থাকে দেশজ সংস্কৃতির ছোঁয়া। ভারতীয় সমাজে— আয়ুর্বেদ, যোগ, ইউনানি, সিদ্ধা ও হোমিওপ্যাথি সংবলিত ‘আয়ুষ’ ঘরানার মধ্যে পাওয়া যায় চিকিৎসার ব্যবস্থার সঙ্গে সংস্কৃতির মেলবন্ধন যার দ্বারা উপকৃত উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার অনুসন্ধানরত অসংখ্য মানুষ। আমেরিকায় হওয়া একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনুযায়ী, নিউরোসাইকিয়াট্রিক লক্ষণযুক্ত অনেক রোগী ‘ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন’ নামক চিকিৎসা ব্যবস্থার সাহায্য নিচ্ছেন। এই কারণে, শুধুমাত্র জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ছাড়াও জীবনশৈলীগত রোগ-ব্যাধি (লাইফস্টাইল ডিজিজ) প্রতিরোধে ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন একটি সম্ভাবনাময় বিকল্প। হাইপারটেনশন (উচ্চ রক্তচাপ), ওবেসিটি (স্থূলতা), হাই কোলেস্টেরল (কোলেস্টেরলের উচ্চ মাত্রা) ও ডায়াবেটিস (মধুমেহ)-এর মতো অধুনা (হালফিলের) মহামারীর প্রেক্ষাপটে এহেন স্বাস্থ্য পরিষেবা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলির সমন্বয় সাধন : মডার্ন ও ট্র্যাডিশনাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সমন্বয়ে মূলধারার স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রটিকে কীভাবে একটি ‘সিঙ্গল-উইন্ডো’ বা ‘এক-জানালা’ ব্যবস্থায় পরিণত করা সম্ভব? চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে রোগী বিনিময় বা তাদের নিজেদের মধ্যে স্থানান্তরণের মাধ্যমে তাদের তরফে রোগাক্রান্তদের উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান এই ক্ষেত্রে একটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হয়ে উঠতে পারে। ট্র্যাডিশনাল ও কনভেনশনাল স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র এক ছাতার নীচে নিয়ে আসা হয়তো যথেষ্ট নয়। সব ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিনের পরিষেবা প্রদানকারীদের একে অন্যের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান সঞ্চয় প্রয়োজন। রোগীদের সুস্বাস্থ্য পরিকল্পনায় তাদের দ্বারা গৃহীত সমস্ত উদ্যোগের সামগ্রিক সমন্বয়ে এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক নির্মাণের দ্বারা অভ্যন্তরীণ শ্রেণীবিন্যাসহীন একটি ব্যবস্থায় উপনীত হওয়াও তাদের বিশেষ প্রয়োজন।

স্মৃতিভ্রংশের মোকাবিলায় : ক্রনিক (দীর্ঘস্থায়ী) রোগাক্রান্ত এবং শারীরিক অক্ষমতা বা নিষ্ক্রিয়তার স্থিতিতে উপনীতদের চিকিৎসায় ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিনের উপকারিতা, অপরিহার্যতা আজ একাধিক গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত। সাইকিয়াট্রি (মনোরোগবিদ্যা) ও নিউরোসায়েন্স (স্নায়ুবিজ্ঞান) সংক্রান্ত শাখার বিশেষজ্ঞ হিসেবে অ্যালঝাইমার ঘটিত স্মৃতিভ্রংশের চিকিৎসায়— যোগব্যায়াম, মিউজিক ও ডান্স থেরাপি, রোগীদের নানা গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিজ (সম্মিলিত কার্যক্রম)-এর মতো গভীর গবেষণালব্ধ নন-ফার্মাকোলজিকাল থেরাপি (ওষুধবিহীন চিকিৎসা প্রণালী)-র কোনো বিকল্প নেই।

ভারতের ভূমিকা : ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন সংক্রান্ত আরও বিশদ গবেষণার প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে পরম্পরাগত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুবৃহৎ ধনভাণ্ডারের অধিকারী দেশ ভারত নেতৃত্বদানের মাধ্যমে ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিনের গবেষণায় ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় এক অগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। একে অন্যের কাজ সম্পর্কে ধারণা অর্জনের সঙ্গে গবেষণা ও পরিকল্পনার পারস্পরিক উপলব্ধির বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবাক্ষেত্রে যুক্তদের উৎসাহদান এবং মানবজাতির বৃহত্তর কল্যাণের উদ্দেশ্যে নতুন পথের অনুসন্ধান এই ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(ই.এস.কৃষ্ণমূর্তি একজন নিউরোসাইকিয়াট্রিস্ট বা মনোরোগবিশেষজ্ঞ এবং বি.এন.গঙ্গাধর ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিনের একজন শিক্ষক)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন। নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

শোকসংবাদ

কলকাতা সল্টলেক নিবাসী প্রবীণ স্বয়ংসেবক রঘুনাথ প্রসাদ কেডিয়া গত ৩১ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। তিনি দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সেবা প্রমুখ এবং কলকাতা মহানগরের ব্যবস্থা প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেছেন। কেশব ভবন নির্মাণে তিনি অন্যতম ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি মূলত ছত্তিশগড়ের রায়পুরের স্বয়ংসেবক হলেও ১৯৪৬ সালে কলকাতায় আসেন। ১৯৪৮ সালে তিনি সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেছিলেন। ১৯৯০-৯২ সালে তিনি করসেবক হিসেবে অযোধ্যায় গিয়েছিলেন। তিনি হরিপদ ভারতীর নেতৃত্বে জনসঙ্ঘেও কাজ করেছেন। তাঁর পরিবারের সকলেই স্বয়ংসেবক। তিনি ৩ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

দ্রুত বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার দিকে এগোচ্ছে ভারত

আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন। এই প্রতিবেদন যখন লিখছি, তখন রামমন্দিরের ঐতিহাসিক উদ্বোধন হতে কিছুটা দেরি আছে ঠিকই, কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে দেশের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মানুষেরও বিপুল উদ্দীপনা চোখে পড়ছে। সময় গড়ালে বোঝা যাবে, রামমন্দির উদ্বোধনে সময় যত এগিয়ে আসবে, তত সোশ্যাল মিডিয়ায় 'রামমিন্দর চাই না, ভাত দে' মার্কা পোস্ট উপচে পড়বে, যেমন 'রামমন্দির করে কী দেশের মানুষের ক্ষুধার জ্বালা মিটবে', কিংবা 'দেশের অর্থনীতি ধুঁকছে, এদিকে সরকার রামমন্দির বানাচ্ছে' ইত্যাকার নানা পোস্ট অযাচিত ভাবেই তৈরি হতে চলেছে, একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। দেখে মনে হবে যেন রামমন্দির তৈরি না হলেই দেশ থেকে বেকারত্ব-সহ অর্থনৈতিক নানা সমস্যা দূর হয়ে যাবে। দেশের সাধারণ মানুষের বুঝতে অসুবিধা হয় না, যে রামমন্দির নির্মাণ একশ্রেণীর মানুষের প্রবল গাত্রদাহের সৃষ্টি করেছে যে, সাম্প্রদায়িক তাস, অর্থনৈতিক সমস্যার কৃত্রিম সৃষ্টি করে মানুষের মনকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হবে, যেমন আর পাঁচটা ব্যাপারে হয়ে থাকে। এই অসুখী মানুষদের জন্য একটা খবর দেওয়া যাক যে, ইতিহাসে প্রথমবারের মতো গত ১৯ নভেম্বর ভারতের জিডিপি ৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি হতে দেখা গেল। এর ফলে, জিডিপির নিরিখে শুধুমাত্র আমেরিকা, চীন এবং জাপান ও জার্মানির পরেই থাকল ভারত। ২০২৪ সালের মধ্যেই ভারতের জিডিপিকে ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে মোদী সরকার। এই ঘটনা, সেই পথে অন্যতম মাইলফলক বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। প্রসঙ্গত, ইন্টারন্যাশনাল মানিটরি ফান্ড, অর্থাৎ আইএমএফ-এর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অনলাইনে 'রিয়েল টাইমে' বিভিন্ন দেশের গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বা মোট উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হয়। এই সাফল্য ভারতের শক্তিশালী অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং একটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে উত্থানের প্রতিফলন বলেই মনে করা হচ্ছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ফোরামে ধরা পড়েছে, কোভিড মহামারির পর বিশ্বের বড়ো অর্থনীতিগুলির মধ্যে, ভারতের অর্থনীতিই সব থেকে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতের সেই অবস্থান, এই সাফল্যে আরও শক্তিশালী হলো বলে মনে করছেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল। ভারতের এই সাফল্যের উচ্ছ্বাস ধরাও পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। বহু মানুষ অনলাইন জিডিপি ট্র্যাকারের স্ক্রিনশট শেয়ার করে, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মোদী সরকারের প্রচেষ্টার প্রশংসাও করেছেন।

রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার অনুমান ছিল, চলতি অর্থবর্ষের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে অর্থাৎ জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি হতে পারে ৬.৫ শতাংশ। তবে কার্যক্ষেত্রে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি হয়েছে ৭.৬ শতাংশ। একাধিক সংস্থার অর্থনৈতিক পূর্বাভাসে দাবি করা হয়েছিলই, বৃদ্ধির পরিমাণ আরবিআইয়ের অনুমানের থেকেও আরও কিছুটা বেশি হবে। আর্থিক বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধি ঘটেছিল ৭.৮ শতাংশ। সেই বৃদ্ধিকেই দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকেই প্রায় অটুট রাখলো ভারত। আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস বলেছিলেনই যে, 'অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতিবেগ দেখে আমি আশা করছি, দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে জিডিপি বৃদ্ধি আমাদের অবাক করে দিতে পারে।' বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের ইকোনমি হয়ে ওঠার পথে দেশের এই নতুন মাইলফলক স্পর্শ করা স্মরণীয় হয়ে থাকবে, এটি ভারতের জন্য দারুণ একটি সাফল্য, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অর্থনীতির এই ৪ ট্রিলিয়ন ডলার হওয়া দেশের শক্তিশালী অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং শক্তিশালী বৈশ্বিক অর্থনীতি হিসেবে ভারতের আত্মপ্রকাশকেই আরও জোরদার করল বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। অর্থনীতির ক্ষেত্রে নানা কৌশলগত পদক্ষেপ ও উদ্যোক্তাদের সঙ্গে নিয়ে ভারতীয় অর্থনীতির অবিরাম উঠে আসার প্রচেষ্টার ফলেই এই সাফল্য, যা আসলে ভারতীয় অর্থনীতিকে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতির একটি হিসেবে তুলে ধরলো বলে মনে করা হচ্ছে।

এর আগে মোদী সরকার আশা প্রকাশ করে জানিয়েছিল, ২০২৪-'২৫ সালের মধ্যে দেশ ৪ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের আগেই ভারতীয় অর্থনীতি সেই মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেছে। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জিডিপি-র দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে, আমেরিকা বিশ্বব্যাপী জিডিপি তালিকায় এক নম্বরে রয়েছে। এর পরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে চীন। তৃতীয় স্থানে রয়েছে জাপান এবং চার নম্বর জায়গা দখল করেছে জার্মানি। অন্যদিকে, ব্রিটেনকে পিছনে ফেলে ভারত দ্রুত এই তালিকায় উঠে এসেছে পঞ্চম স্থানে। তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন, ভারতীয় অর্থনীতির গতি এমন ভাবেই অব্যাহত থাকলে আগামী তিনবছরে ভারত জার্মানি ও জাপানকে পেছনে ফেলে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হতে পারে। কয়েক মাস আগে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার রিপোর্টেও দাবি করা হয়েছিল যে, ভারতীয় অর্থনীতি আগামী ৪ বছরের মধ্যে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে। সেক্ষেত্রে ভারতের সামনে থাকবে শুধুমাত্র চীন ও আমেরিকা। বিশেষজ্ঞরা এও মনে করছেন, চীনের অভ্যন্তরে তাদের দমন-পীড়ন নীতি আসলে তাদের অর্থনীতির কঙ্কালসার চেহারাটাই প্রকাশ করে ফেলেছে। এক্ষেত্রে ভারতের সামনে থাকবে শুধু বর্তমানে পৃথিবীর সমৃদ্ধ অর্থনীতি আমেরিকাকে টপকে যাওয়ার হাতছানি। □

কর্তব্যবোধ এবং শাশ্বত জীবনমূল্যের সন্ধানে

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

যে সদর্থক ও শোভনীয় কর্ম করা উচিত, যা নীতিগতভাবে আবহমানকাল ধরে আদৃত, তাই কর্তব্য। কৃ+তব্য=কর্তব্য (কৃৎ-প্রত্যয়, ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হওয়া)। বাংলায় প্রত্যয় মানে হলো 'বিশ্বাস'। কোনো একটি শব্দকে বা ধাতুকে একটা context-এ ব্যবহারের জন্য 'প্রত্যয়' বিশ্বাসভাজন করে তোলে। এখানে 'তব্য' প্রত্যয়ে ঔচিত্য বিষয়ে বিশ্বাসভাজন করে তুলছে। যেমন, জ্ঞাতব্য (এই জ্ঞানটা রাখা উচিত), গন্তব্য (এই স্থানে পৌঁছে যাওয়া উচিত), পঠিতব্য (এই পাঠটা নেওয়া উচিত)। সে রকম 'কর্তব্য' হলো যে কাজ আমার করা উচিত।

জীবনচর্যায় যখন কোনো একটি মিশন বা উদ্দেশ্যকে একটা নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত যাওয়া উচিত বলে মনে করি, সেটাই আমার কর্তব্যবোধ। একটা শিশুকে জন্ম দিয়েছি মানে আমার একটা মিশন শুরু হলো। আমার কর্তব্য স্থির হচ্ছে, সে যতদিন না পর্যন্ত নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছে এবং নিজের বোধ দ্বারা চালিত হতে শিখছে, ততদিন পর্যন্ত তার পাশে থাকবো— এটাই আমার কর্তব্য।

আমরা যখন কোনো মহাপুরুষের কথা বলবো, তখন এটা দেখবো যে, দেশ ও জাতি গঠনে তিনি কত সুষ্ঠুভাবে জীবনচর্যায় কর্তব্যটাকে পালন করেছেন। যে ব্যক্তির কর্তব্যনিষ্ঠা যত বেশি গভীর, তিনি তত বড়ো মহাপুরুষ। এই কর্তব্যবোধটা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে একেবারে কেন্দ্রীভূত হয় একটি পরিজন বা পরিবারকে কেন্দ্র করে। মহৎ যাঁরা হন, যাঁরা সমাজ ও সংসারে মহাপুরুষ হিসেবে স্বীকৃত হন, তাঁদের কর্তব্যবোধে একটা বিশালত্ব থাকে। সমগ্র মানব জাতির উন্নতির জন্যই সেই কর্তব্যবোধ চালিত হয়।

স্বামীজী নারীর উন্নতির কথা ভেবেছেন; বারবার তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন; এমনকী নারীর আদর্শের কথাও শুনিয়েছেন, 'হে ভারত, ভুলিয়ো না তোমার নারী জাতির আদর্শ...।' সমকালে দাঁড়িয়ে ইউরোপীয় মহাপুরুষের এটা বলার প্রয়োজন ছিল না, বলেনওনি। কিন্তু ভারতের প্রেক্ষাপট তখন আলাদা, নবজাগরণের পর্ব। তার অন্যতম প্রয়োজন নারীমুক্তি। ভারতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাই স্বামীজী এই কর্তব্যবোধ দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। ভগিনী নিবেদিতাকে বালিকা বিদ্যালয় গঠনের উপদেশ দিয়েছেন। একেই বলে সামাজিকভাবে চালিত হওয়া।

স্বামীজীর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব অসম্ভব ভালো কর্তব্য স্থির করে দিতে পারতেন। তিনি ছিলেন জন্মগত সিদ্ধ পুরুষ। অসম্ভব বাস্তববাদী মানুষ ছিলেন তিনি। কাশীপুরের শেষশয্যায় স্বহস্তে লিখে গেছিলেন, 'নরেন লোকশিক্ষে দেবে--- যখন ঘুরে বাহিরে (ঘরে-বাইরে) হাঁক দিবে'। নরেন কীভাবে শিক্ষা দিয়েছেন? নিজে আচরণ করে সেই শিক্ষা দিয়েছেন; যাকে স্বামীজী নিজেই বলেছেন 'প্র্যাক্টিকাল বেদান্ত'। 'শিব জ্ঞানে জীব সেবা'। সে সময় ভারতের যুব-সমাজের কৃচ্ছসাধনের প্রয়োজন ছিল। পরিব্রাজক বিবেকানন্দ সমগ্র ভারতের অন্তরাত্মাকে চিনতে, জানতে চেয়েছিলেন; গোটা ভারতের দর্শনকে বুঝতে চেয়েছিলেন। এই যে পরিব্রাজনের নামে কৃচ্ছ্রসাধন, তা যুব সম্প্রদায়ের প্রতি এক উজ্জ্বল শিক্ষার নিদর্শন; নিজের জীবন, আচরণ দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার শিক্ষা। কোন লক্ষ্যে যাত্রা করবেন তার জন্যই তৈরি হলো মিশন; রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। তেমনই 'দিল্লি চলো' ডাক দিয়ে নেতাজী উজ্জীবিত করলেন আজাদ হিন্দ ফৌজকে।

ভারতবাসীর কাছে স্বরাজ সাধনার ধারাকে বাস্তবতার পথে প্রবাহিত করলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র ও অরবিন্দের চেতনায় স্বরাজের ভিন্নতর ধারাকে সমন্বয় করে বাস্তবের মাটিতে নামলো স্বরাজ্য ভাবনা, তার মহারথী সুভাষ। বঙ্কিম-মানসে ছিল অখণ্ড-জাতির ভাবনা আর অসুর বিনাশের যজ্ঞ; সাহিত্য-স্বরাজ। স্বামী বিবেকানন্দে প্রতিভাত হলো ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক স্বরাজ। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধনার ধারার মধ্যে মুক্তি পেল ভারতবর্ষের অখণ্ড চেতনার রূপ-রস-গন্ধ। শ্রীঅরবিন্দ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সুরে ভারতবীণায় বেঁধে দিলেন রাজনৈতিক স্বরাজবোধ। এই সকল পথের অমোচ্য সংগীতে শুরু হলো স্বাধীন ভারতবর্ষ গঠনের জন্য যুদ্ধ; সুভাষ তার মহাধিনায়ক। বিশ্বের সকল ঘটনাকে বাস্তবতার লাশকাটা ঘরে কাটাছেঁড়া করে, তিনি শত্রু-মিত্র জটিলতাকে সহজ সরল রূপ দিলেন, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ যার অন্যতম চালিকাশক্তি। দেশবিরোধী শক্তি তাঁকে নানান গালমন্দে ভূষিত করল;

> **জানুয়ারির ১২ থেকে ২৩ এর মাঝে, দুই জন্মদিনের শুভক্ষণের মাঝে আমরা দেশবাসী 'কর্তব্যবোধ দিবস' পালন করতে পারি, মূল্যবোধের আদর্শে জারিত হতে পারি। শপথ নিতে পারি দেশমাতৃকাকে সযতনে রক্ষার, দেশকে গড়ে তোলার।**

ফঃ ২

খসে পড়ল নানান ব্যক্তিত্বের রাজনৈতিক মুখোশ। কিন্তু নেতাজী অনন্য; আত্মত্যাগ ছাড়া যে রাজনীতির লড়াইয়ে শাশ্বত জয় সম্ভব নয়, তা তিনি ভারতবাসীকে এবং ভারতের রাজনীতিবেত্তাদের বুঝিয়ে দিলেন। ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে যতদিন না তাঁর সংগ্রাম, চরিত্রশক্তি, নিঃস্বার্থপরতা, মানবিকতা, প্রাণময়তা ও অভিজ্ঞতাকে আমরা মূলধন না করবো ততদিন তাঁর আত্মার শান্তি নেই; পরগাছা থেকে মুক্তি নেই ভারতবর্ষের।

'যুক্তকর' (১৮৯৪) প্রবন্ধে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু লিখেছেন, 'পুরাতন লইয়াই বর্তমান গঠিত, অতীতের ইতিহাস না জানিলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অজ্ঞেয়ই রহিবে। পুরাতন ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে সেকালে সর্বসাধারণের দৈনন্দিন জীবন কীরূপে অতিবাহিত হইত, তাহা জানা আবশ্যক।' এদিকে জীবন আমাদের কাছে মূল্যবান। আর এই মূল্যবান জীবনকে সুষ্ঠু রাখার জন্য আমাদের মধ্যে কতকগুলো মূল্যবোধ তৈরি হয়। জীবনানন্দ লিখছেন, 'শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলই অনন্ত সূর্যোদয়।' রাত্রি যদি চিরকালীন হয়, রাত্রির বুকে প্রভাত আসাটাও চিরকালীন সত্য।

মূল্যবোধ দুই প্রকার— শাশ্বত ও পরিবর্তিত। কিছু মূল্যবোধ জীবনের সঙ্গে সঙ্গে, কালের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। ধারণার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্তিত হয় সেই মূল্যবোধ। কিন্তু শাশ্বত মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে না; তা ধ্রুব, স্থির। যেমন— সদা সত্য কথা বলিবে— এটি একটি শাশ্বত মূল্যবোধ। আবার বিধবা বিবাহ নীতিবোধ-রহিত— এটা পরিবর্তিত মূল্যবোধ। বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের পর মূল্যবোধ বা নীতিবোধের পরিবর্তন ঘটেছে। শাশ্বত মূল্যবোধ বাস্তব জীবনে পুরোপুরি মানা হয়তো সম্ভব নয়, কিন্তু চেষ্টা করতে হবে, যতটা মানা সম্ভব হয়। যত বেশি করে তা মানা সম্ভব হবে আমাদের জীবন ততই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠবে।

যে মূল্যবোধ অধুনা অপ্রচলিত কিন্তু তা আচরণীয়, তা অনুসরণের মাধ্যমে সৌকর্য বৃদ্ধি হতে পারে। যেমন একদা নারীকে দেবী বলতাম আমরা, কিন্তু সমাজ, জাতি ও দেশে সেই প্রতিফলনের অভাব; তা যদি পালনীয় বলে অনুভূত হতো, তবে সমাজের অপর পাখাটি ঠিক মতো ডানা মেলত।

Value শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো মূল্যবোধ; এটি ব্যক্তি-স্বতন্ত্র পরম বা আপেক্ষিক মান যা মানুষের মধ্যে বিরাজিত বিচারবোধের পরিমাপক। মূল্যবোধের প্রেক্ষিতেই মানুষ ভালো বা মন্দকে পৃথকভাবে বাছতে শেখে, মন্দকে পরিহার করে ভালোর অভিমুখে যাত্রা শুরু করতে শেখে। যে অন্তর্নিহিত বোধের দ্বারা মানুষ মন্দের পরিচয় পেয়ে তা থেকে দূরে থাকে এবং ভালোর সন্ধান পেয়ে তাতে সংপৃক্ত হয়, তার সহজাত বিচার-শক্তিই হলো মূল্যবোধ।

ব্যক্তি মানুষের এই ধারণা একটি শুভঙ্করী ধারণার পক্ষে সংহত হলে এবং তা সামাজিক ব্যাপন প্রক্রিয়ার দ্বারা সম্প্রসারিত হলে সমাজ গঠনে তা সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। এই মূল্যবোধের প্রথম ও প্রধান আকর হলো তার পরিবার, এই বোধের শিক্ষা মানুষ তার অনুকূল গৃহ পরিবেশের মধ্য থেকে পেয়ে থাকে। মূল্যবোধের উপযোগী গুণগুলিই মানুষের ব্যক্তিচরিত্রকে পবিত্র করে তোলে; মানুষ হয়ে ওঠে মহাপুরুষ। যদি কোনো সমাজে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষের মূল্যবোধের মধ্যে নীতিকর্ম, দেশপ্রেম, মানবপ্রেম-সহ নানান আঙ্গিক সংযোজিত হতে থাকে, তবে সেই সমাজও প্রশাসনব্যবস্থাকে সুপথে চালিত করার ক্ষমতা রাখে। কাজেই মূল্যবোধের নিবিড়-পাঠ গৃহে ও বিদ্যালয়ে সম্প্রসারিত হওয়া বিশেষভাবে কাম্য। ইতিবাচক সমাজের চাহিদা অনুসারে আলোকিত মানুষ গড়ার লক্ষ্যে মূল্যবোধের শিক্ষা জরুরি।

স্বামী বিবেকানন্দ ছাত্র ও যুবসমাজকে সামাজিক মূল্যবোধে জাগরিত ও জারিত করেছিলেন। কিন্তু কীভাবে? 'সন্ন্যাসী' শব্দটির সঙ্গে প্রথাগতভাবে 'অধ্যাত্ম' এবং 'অধ্যাত্ম' শব্দের সঙ্গে তথাকথিতভাবে 'বার্ধক্য'-র সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও বিবেকানন্দের সঙ্গে ছাত্র ও যুবসমাজ কীভাবে যুক্ত হলেন? কারণ বালক বিলের ইচ্ছা ছিল ভবিষ্যতে সে হবে ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ান, অর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ গাড়িকে নিয়ে গন্তব্যের দিকে ছুটতে পারার ইচ্ছে। সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিকে সুনির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছে। ইচ্ছে ও শক্তি দুই-ই ছিল বিলের। যুবক নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে এসে বুঝেছিলেন, ভারতাত্মায় আছে বিশ্বকে উত্তরণের মন্ত্র। কিন্তু সে শিক্ষা জগতের গোচরে আনতে হবে। তাই তাঁর শিকাগো যাত্রা। গুরু তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কর্মযোগে বিভোর হতে, তাই তাঁর রামকৃষ্ণ-মিশন প্রতিষ্ঠা। তিনি শুধু সন্ন্যাসী নন, তিনি বীর সন্ন্যাসী, যিনি ভারতকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে চান, নিজের মোক্ষ চান না। তিনি গুরুর কাছে শিখেছিলেন বাস্তব জীবনচর্যার পাঠ। এমন যুবক-কর্মযোগী তরুণ যে ছাত্র ও যুবশক্তির কর্তব্যবোধ ও মূল্যবোধের প্রেরণা হবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী!

ভারতের ছাত্র ও যুব সমাজ ছিল স্বামীজীর লক্ষ্য। আধ্যাত্মিক ভারতের বিশ্বব্যাপী প্রসারে যে বিশ্বে শান্তি আসবে, তা তিনি বুঝেছিলেন। তাঁর প্রত্যাশা দুটি দিক থেকে বিচার করা সম্ভব— ১. তাঁর জীবনাচরণ ও কর্মপন্থার মধ্য দিয়ে, ২. তাঁর চিরস্মরণীয় বক্তব্যের মধ্য দিয়ে।

গুরুর কাছে দীক্ষার পরে বরানগরে কয়েকজন যুবক মিলে একসঙ্গে বসবাস করে দেশ ও দশের চিন্তায় মন-প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। মিশন তৈরির গোড়াপত্তন এখান থেকেই। গন্তব্যের জন্য সর্বস্বত্যাগের শিক্ষা এখান থেকেই পাওয়া যায়। পারিবারিক পিছুটান, দারিদ্র্যের কাঠিন্য— কোনো কিছুই তাঁকে গন্তব্যচ্যুত করতে পারেনি। বর্তমান ভারতের Restless যুবশক্তি কথায় কথায় বিদেশ পাড়ি দেয়। যে মানুষটা শুধু পাতা উলটিয়ে বই মুখস্থ করতে পারতেন, তাঁর প্রতিভার কী অভাব ছিল? তিনি তাঁর দরিদ্র ভারতবাসীর জন্য উৎসর্গীকৃত ছিলেন বলেই ব্যগ্র হয়ে ওঠেননি নিজের উন্নতিকল্পে। এই রাষ্ট্রচেতনা প্রতিটি যুবকের মধ্যে থাকা দরকার।

স্বামীজী পদব্রজে ঘোরেন সমগ্র দেশ। ভারতবর্ষকে চিনে তবেই নিজেকে চেনেন। স্বচক্ষে দেশের প্রতিটি মানুষের জীবনাচর্যার পরিদর্শন প্রবাস ছাড়া সম্ভব নয়। রাষ্ট্রকে অন্তর থেকে চেনার প্রয়াস তাঁর জীবনচর্যাই শেখায়!

রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'শান্ত মোরা, ভদ্র অতি পোষ মানা এ প্রাণ/বোতাম আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান।' এ বর্ণনা বাস্তব। কিন্তু কোনো বাঙ্গালি এমনও জন্মান, যাঁরা 'ব্যাঘ্রে-বৃষভে' সমন্বয় ঘটান। তেমনি এক বাঙ্গালি যুবক নরেন্দ্রনাথ। শান্ত ছিলেন, ভদ্রও ছিলেন। কিন্তু নিদ্রিত ভারতকে জাগানোর আগুন ছিল তার প্রাণে। তাই শান্তিতে শুয়ে থাকার মানুষ তিনি ছিলেন না। বিশ্বের আঙিনায় ভারতীয় অধ্যাত্মের সাজি নিয়ে তিনি গেলেন বিশ্ব ধর্মসভায়। বিশ্বমাঝে স্বাতন্ত্রের আসন তৈরি করার শিক্ষা আজ যুব সমাজের নেওয়া উচিত স্বামীজীর থেকে।

স্বামীজী আগুনের ভাষায় যুবকদের মধ্যে অসীম শক্তি সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। হিন্দু যুবকদের উদ্বুদ্ধ করেছেন, আত্ম-চেতনা জাগিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, 'তোমার মধ্যে অসীম শক্তি, তুমিই আনন্দময়।' 'Arise, awake and stopnot till the goal is reached.' বলেছেন, শক্তিই জীবন এবং শক্তির শুভ প্রয়োগই ধর্ম।

স্বামীজীকে দেখা গেছে গভীর-গহন তত্ত্বের শিক্ষা দিতে; মিশনের মাধ্যমে মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের শিক্ষা দিতে। পাশ্চাত্যের ভোগবাদের তীব্র প্রতিবাদ করে, প্রাচ্যের 'পেটের চিন্তা' দূর করতে তাঁর হাঁক। এ পথে যেতে হলে ঐশী অবগাহন জরুরি, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।' স্বামীজীর শিক্ষাদর্শনের মূল কথা হলো, সংবিৎ-গৃহ। জ্ঞানের বসতবাড়ি হলো আমাদের অন্তর, আমাদের ভেতরের প্রকোষ্ঠ। সেই অন্তর-কে প্রকাশ করতে হবে। অন্তরবাসীকে বাইরে বোধন করতে হবে। এই বোধনের দায়িত্বটুকু পালন করবে শিক্ষাব্যবস্থা। আত্মনির্ভরশীল যুবসমাজ সেই কাজে বড়ো ভরসা। বলছেন, 'জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভর হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত সাহায্য হবে না।' শিক্ষা বলতে শুধু তথ্য সংগ্রহ তো নয়! তথ্য সংগ্রহ আর জ্ঞানার্জন এক নয়। 'তথ্য সংগ্রহ করাই যদি জ্ঞান হয়, তাহলে লাইব্রেরির থেকে জ্ঞানী তো আর কেউ নেই।' স্বামীজী জীবনমুখী শিক্ষার অবতারণা করলেন এই মন্তব্যে। বই মুখস্থ নয়, চাকরি জোটানোর শিক্ষা নয়, কেরানি তৈরি নয়। অন্তর্নিহিত পূর্ণত্বের বিকাশ ব্যতিরেকে শিক্ষা সম্পূর্ণ নয়। ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমে চরিত্রবল আসে, মনের তেজ বিকশিত হয়। তাই ব্রহ্মচর্য পালন জরুরি।

স্বামীজীর আর একটি পরামর্শ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, 'নেতা হতে যেয়ো না, সকলের সেবা করো। নেতৃত্বের এই পাশব-প্রবৃত্তি জীবনসমুদ্রে অনেক বড়ো বড়ো জাহাজ ডুবিয়েছে।' বলছেন, আদর্শ নেতারা আপন ব্যক্তিত্বের জন্যই সফল হতে পেরেছেন। নেতা যখন বলতে পারেন 'বহু জনহিতায় বহুজনসুখায়' তখনই সাফল্য লাভ হয়। নিখুঁত ও শুদ্ধচরিত্রের নেতা চাই। আপাতদৃষ্টিতে শিশুকে মনে হয় সকলের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সেই তার শৈশব-সত্তা দিয়ে গোটা বাড়ি শাসন করে। শ্রেষ্ঠ নেতার চালিকাশক্তিও হবে শিশুর মতো; সরল, পবিত্র, বাল্যগাম্ভীর্যভাব মিশ্রিত, অথচ সকলের দ্বারা পরিচালিত। সকলের প্রভু তিনিই হতে পারেন, যিনি সকলের দাস। যার প্রেমে উচ্চ-নীচ নেই, কোনোরূপ অহংভাব নেই, সম্প্রদায়-বুদ্ধি নেই, তিনিই আদর্শ নেতা। নেতার সহায়ক সঙ্ঘশক্তি থাকতে হবে, যে সঙ্ঘশক্তি আজ্ঞানুবর্তিতার জন্ম দেয়। আদর্শ নেতা তিনিই, যিনি মহাশত্রুর প্রতিও সর্বদা হিতবচন প্রয়োগ করেন। নেতা সংগঠনে সমালোচনার বদলে ইতিবাচক কথা বলবেন। তার কাজ হলো যা বলার আছে বলা এবং যা শেখানোর আছে শেখানো। ওইখানেই তার কর্তব্য শেষ। বিরুদ্ধ সমালোচনা সকল সর্বনাশের মূল।

তিনি লিখেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিতা 'Kali the Mother', যার পরতে পরতে মহাকালীর তাণ্ডব, প্রগাঢ় মানসিক অভিভবে ধ্বংসলীলা। আপন বোধকে লক্ষ-কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কথা। 'সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,/কাল-নৃত্য করে উপভোগ,/মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।' এ যে ভয়ংকরের পূজা, মৃত্যুর পূজা, এ যে কাপুরুষের আত্মহত্যা নয়, এ যে শক্তিমানের মৃত্যু সম্ভাষণ! কবিতার মধ্যে ভাব-শিষ্যদের প্রতি শক্তি-সাধনার আহ্বান রয়েছে, এক অভাবনীয় কর্তব্যবোধ। সে কাজ স্বামীজীর একলার পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না। স্বামীজী তখন ক্লান্ত, অসুস্থ; সনাতনী ধর্মের প্রচার ও প্রসারে জীবনী-শক্তি নিঃশেষ করে ফেলেছেন। তাই কাব্যের মোড়কে স্পষ্টই বার্তা দিয়েছিলেন আগামী প্রজন্মের প্রতি। এটাই এখন পালন করতে হবে।

এ কাজ করতে স্বামীজীর কথামতো তাই আমাদের মাংসপেশী লোহার মতো তৈরি করতে হবে, স্নায়ুগুলি ইস্পাতের মতো তৈরি করতে হবে, আর দেহের মধ্যে মন বজ্রের উপাদানে গঠন করতে হবে। এসব যুবশক্তির প্রতি তাঁর কর্তব্যবোধের আহ্বান। শারীরিক দৌর্বল্য আমাদের দুঃখের কারণ। আমরা একসঙ্গে মিলতে পারি না, পরস্পরকে ভালোবাসি না, তোতাপাখির মতো কথা বলি, আচরণে পশ্চাৎপদতা দেখাই। কারণ শারীরিকভাবে আমরা দুর্বল। ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবন নিহিত আছে হিন্দুধর্মে। স্বামীজী ভারতবর্ষের এই জাতীয় চরিত্র বদলের কথা বলেননি। দেশকে ধর্মের মধ্য দিয়েই সব করতে হবে। 'রাস্তা ঝেঁটানো, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে তো হবে, নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামিচিই সার...।'

স্বামীজীর কর্তব্যবোধ স্মরণ করে আমরা যদি শক্তি সঞ্চার করতে না পারি, তাঁকে স্মরণ-মনন করা বৃথা। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ধর্ম করা, আর ধর্ম জয়ের পথে অমিত শক্তির ব্যবহার করাই গীতার বাণী। ভারতবর্ষ যেমন সন্তভূমি, ভারতবর্ষ বীরভূমিও বটে। যুবসমাজকে দৈনিক শরীরচর্চা করতেই হবে। হিন্দু নামে গর্ব অনুভব করতেই হবে। তবেই বিবেক-শুভ্র বিবেকানন্দের জন্মদিন, প্রয়াণ দিবস, শিকাগো বক্তৃতা দিবস পালন সার্থক হবে।

জানুয়ারি মাসে স্বামীজী ও নেতাজী— এই দুই মনীষীর শুভ আবির্ভাব। তাই জানুয়ারির ১২ থেকে ২৩ এর মাঝে, দুই জন্মদিনের শুভক্ষণের মাঝে আমরা দেশবাসী 'কর্তব্যবোধ দিবস' পালন করতে পারি, মূল্যবোধের আদর্শে জারিত হতে পারি। শপথ নিতে পারি দেশমাতৃকাকে সযতনে রক্ষার, দেশকে গড়ে তোলার। 'কর্তব্যবোধ' হলো ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সুলুকসন্ধান এবং তার যথাযথ রূপায়ণ। □

রামমন্দির নতুন ভারতে কর্তব্যবোধের প্রেরণা জোগাবে

> “প্রজাদের সুখের জন্য শ্রীরামচন্দ্র নিজের অর্ধাঙ্গিনীর প্রতি অগাধ প্রেম, বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও মা সীতাকে দিতে হয়েছিল অগ্নি পরীক্ষা, যেতে হয়েছিল বনবাসে। অহংকার, আসক্তি, দাম্ভিকতা কর্তব্যবোধ ভুলিয়ে দিয়ে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়— ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণের মতো অজেয় যোদ্ধাদের মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়তে দেখেও রাবণের কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়নি।”

সাধন কুমার পাল

ভারতবর্ষের সবচাইতে বড়ো শিক্ষক সংগঠন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের একটি অবশ্য পালনীয় কার্যক্রম কর্তব্যবোধ দিবস। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন ১২ জানুয়ারি থেকে শুরু করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই দিনটি পালিত হয়ে থাকে। ২০২৪-এর কর্তব্যবোধ দিবসের অনুষ্ঠানে একটি অন্য মাত্রা পেতে চলেছে। কারণ এই বছর ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় শ্রীরাম মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। রামমন্দির শুধুমাত্র পূজাপাঠ বা নিছক ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের একটি কেন্দ্র নয়। রামমন্দির দেশ নির্মাণ ও জাতি গঠনের একটি মাধ্যম। কর্তব্যবোধের মতো উচ্চ আদর্শের দীক্ষা ছাড়া দেশ নির্মাণ ও জাতি গঠন কোনোটাই সম্ভব নয়। ভগবান শ্রীরামের উদ্দেশ্যে বলা হয় ‘রামোঃ বিগ্রহবান ধর্ম’। তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম। ধর্ম মানে ইংরেজি রিলিজিয়ান নয়। ধর্মের অর্থ হলো ‘করতেই হবে এমন কাজ’। সেজন্য ‘কর্তব্য’ হলো ধর্মের খুব কাছাকাছি প্রতিশব্দ। শ্রীরামের জীবন বৃত্তান্ত দেখিয়ে দেয় একজন সংস্কারক হিসেবে, একজন যোদ্ধা হিসেবে, একজন লোক শিক্ষক হিসেবে, একজন রাজা হিসেবে, কীভাবে নিজের মর্যাদার সীমার মধ্যে থেকে কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। রামমন্দির সদা সর্বদা ভগবান শ্রীরামের কর্তব্যবোধের আলোকে মানব সমাজকে আলোকিত করে রাখবে।

যে রামায়ণের আদর্শকে মানুষের সামনে জীবন্ত করে তোলার জন্য এই রামমন্দির নির্মাণ, সেই রামায়ণ সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘দেবতার অবতারলীলা লইয়াই যে এ কাব্য রচিত তাহাও নহে। কবি বাল্মীকির কাছে রাম অবতার ছিলেন না, তিনি মানুষই ছিলেন— পণ্ডিতেরা ইহার প্রমাণ করিবেন। এই ভূমিকায় পাণ্ডিত্যের অবকাশ নাই ; এখানে এইটুকু সংক্ষেপে বলিতেছি যে, কবি যদি রামায়ণে নরচরিত্র বর্ণনা না করিয়া দেবচরিত্র বর্ণনা করিতেন তবে তাহাতে রামায়ণের গৌরব হ্রাস হইত, সুতরাং তাহা কাব্যাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। মানুষ বলিয়াই রামচরিত্র মহিমান্বিত।’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর এই রচনারই অন্য জায়গায় লিখেছেন, ‘...রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে। রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।’ রামমন্দির পুনর্নির্মাণ হিন্দু সমাজের কর্তব্যবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত— ভোটের রাজনীতি যখন শুরু হয়নি, ইসলামিক শাসন এবং ইংরেজ শাসনামলেও রামমন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য হিন্দু সমাজ ৫০০ বছর ধরে নিরন্তর প্রয়াস করেছে। এর জন্য লক্ষ লক্ষ প্রাণের আহুতি দিতে হয়েছে। মন্দিরের প্রতীককে সামনে রেখে ৫০০ বছর ধরে নিজেদের হারানো সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য নিরন্তর লড়াই করার মতো কর্তব্যবোধের দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত এই পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। শ্রীরাম ও রামায়ণের প্রতিচ্ছবি রামমন্দির কেন এত গুরুত্বপূর্ণ তা রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য থেকেই জানা যাক। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘এমন অবস্থায় রামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে; ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে, কারণ সেরূপ ইতিহাস সময়বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে— রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।’

পরিবারকে অটুট রাখার কর্তব্যবোধ : একটি পরিবারকে অটুট রাখার জন্য সেই পরিবারের সঙ্গে যুক্ত সকলেরই গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভূমিকা থাকে। সে পরিবারের কাজের লোক, গাড়ির ড্রাইভার এরকম যে কোনো ব্যক্তি হতে পারে। কোনো একটি পরিবারে দুর্ভাগ্যবশত একজন মন্থরা চরিত্রের আবির্ভাব হয়ে গেলে সেই পরিবারকে কী করে অটুট রাখতে হয় সেই শিক্ষা আমরা ভগবান শ্রীরামের জীবন থেকে পাই। বৃদ্ধ রাজা দশরথ শ্রীরামকে বলছেন যে তোমার মেজো মা আমাকে দিয়ে কিছু ভুল কাজ করিয়ে নিচ্ছে। তুমি তো অযোধ্যার সেনাপতি তোমার হাতে অস্ত্রশস্ত্র,

সৈন্য সামন্ত সমস্ত কিছুই আছে। সেজন্য তুমি আমাকে বন্দি করে রেখে দাও তাহলে আমার দেওয়া কথার খেলাপ হবে না, সেই সঙ্গে তোমার রাজ্যাভিষেকও হয়ে যাবে। আমি কারাগারে যেতে রাজি আছি কিন্তু তোমাকে রাজ্য থেকে বহিষ্কারের দৃশ্য আমি দেখতে চাই না। এদিকে লক্ষ্মণ দাদাকে বলছেন, কাঁধে তির-ধনুক নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো কিন্তু পরিবারের ভেতর অত্যাচার অনাচার হচ্ছে সেটা দেখতে পাচ্ছ না। বলছো সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়ে গাছের ছাল পরে বনে চলে যাবে। আমি কেমন দাদার পূজা করেছি, কাকে আমি নায়ক বলে মেনে নিয়েছি, ঘরে অত্যাচার হচ্ছে, অনাচার হচ্ছে সেটার প্রতিকার কি হবে না? দাদা, তুমি এক সময় বলতে, অত্যাচার সহ্য করব না, অনাচার সহ্য করব না, কিন্তু এই ঘরেই অত্যাচার হচ্ছে, অনাচার হচ্ছে, কেমন করে তুমি তা সহ্য করছো? কেন তুমি তির-ধনুক উঠাচ্ছো না?

শ্রীরাম বলছেন কার উপর, কাকে তির মারবো? এই মায়ের উপর? যে মায়ের কোলে আমি সমস্ত বাল্যকাল কাটিয়েছি। সেই মাকে তির মারবো? যে পিতা সকালবেলা উঠে চুল আঁচড়ানোর সময় একটি সাদা চুল দেখে গুরুদেবের আশ্রমে গিয়ে নিজে থেকেই বললেন, গুরুদেব আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, রাজ্যভার রামের উপর অর্পণ করতে চাই। সেই পিতাকে তির মারবো? এই অপাপবিদ্ধ ভরতকে তির মারবো? বলো লক্ষণ, আমি কাকে তির মারবো?

আজকের দিনে মানব সভ্যতাকে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ অবদান পরিবার প্রথাকে ভাঙার জন্য সিনেমা সিরিয়ালের মাধ্যমে নিরন্তর বিষাক্ত সংস্কৃতির আক্রমণ হচ্ছে। সেই পরিস্থিতিতে পরিবারের সংকট সময়ে ভগবান শ্রীরামের কর্তব্যবোধ আমাদের সকলের অনুকরণীয়। পরিবারকে অটুট রাখার জন্য পরিবারের কোনো সদস্যের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত কিছুকে বিসর্জন দেওয়ার এই উচ্চ আদর্শ ভগবান শ্রীরাম আমাদের সামনে রেখেছেন। শ্রীরাম শুধু নিজের পরিবারে নয়, বনে গিয়ে সুগ্রীবকে, হনুমানের মতো অনেককেই নিজের ভাইয়ের মতো বুকে টেনে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে রাবণকে দেখুন, নিজের সহোদর বিভীষণকে লাথি মেরে লঙ্কা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

রামায়ণকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সম্পর্কে

লিখেছেন, 'ইহাতে কেবল কবির পরিচয় হয় না, ভারতবর্ষের পরিচয় হয়। গৃহ ও গৃহধর্ম যে ভারতবর্ষের পক্ষে কতখানি, ইহা হইতে তাহা বোঝা যাইবে। আমাদের দেশে গার্হস্থ্য আশ্রমের যে অত্যন্ত উচ্চস্থান ছিল, এই কাব্য তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। গৃহাশ্রম আমাদের নিজের সুখের জন্য, সুবিধার জন্য ছিল না; গৃহাশ্রম সমস্ত সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিত ও মানুষকে যথার্থভাবে মানুষ করিয়া তুলিত। গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য। এই গৃহাশ্রম-ধর্মকেই রামায়ণ বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া বনবাসদুঃখের মধ্যে বিশেষ গৌরব দান করিয়াছে। কৈকেয়ী মন্থরার কুচক্রান্তের কঠিন আঘাতে অযোধ্যার রাজগৃহকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিয়াছিল, তৎসত্ত্বেও এই গৃহধর্মের দুর্ভেদ্য দৃঢ়তা রামায়ণ ঘোষণা করিয়াছে। বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে, শান্তরসাস্পদ গৃহধর্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।'

আসুরিক ভাবনা কর্তব্যবোধের বড়ো শত্রু : শূর্পণখার নাক কাটা যাওয়ার পর সে রাবণকে একটি কথা বারবার বলেছিল যে আমি রাবণের বোন বলা সত্ত্বেও আমাকে ওরা অপমান করেছে। অর্থাৎ দাদার অহংকারকে আরও উসকে দিয়ে নিজের জেদ পূরণের দিকেই সম্পূর্ণ দৃষ্টি দিয়েছিল শূর্পণখা। দাদার সুরক্ষা, দাদার ভালো-মন্দের দিকে একবারও নজর দেয়নি। সে রাবণকে আরও বুঝিয়েছিল যে ওই বনবাসীর সুন্দরী স্ত্রী আছে, সেই নারীর উপর অধিকার তোমার। একজন বোন হিসেবে সেদিন দাদার মূল্যবোধ রক্ষার কর্তব্যবোধকে ভুলে গিয়ে তার অহংকারকে উসকে দিয়ে রাক্ষসকুলের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল শূর্পণখা।

এই ভাবনার ঠিক বিপরীত সীতামাতা ও প্রকৃতিদেবীর মধ্যে সম্পর্কের সমীকরণে ভাই-বোনের সম্পর্কের উচ্চ আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। সীতার জন্ম ভূমিতে। সেই জন্য সীতাকে ভূমিজা বলা হয়। তৃণও ভূমিতেই জন্মায়। সেজন্য তৃণের সঙ্গে সীতার ভাই-বোন সম্পর্ক। একদিন অশোক বনে রাবণ আক্রমণ করতে এলে সীতা একটি তৃণের অগ্রভাগ সামনে রেখে রাবণকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, আমাকে তো দূরের কথা তুমি এই সামান্য তৃণ খণ্ডটিকেও সরাতে পারবে না। ভূমিকন্যা সীতার বিশ্বাস ছিল যে এই তৃণের সঙ্গে তাঁর ভাই-বোনের সম্পর্কে আবদ্ধ। এই তৃণ, এই উদ্ভিদরাজি এরাই ওঁকে রক্ষা করবে।

কর্তব্যবোধের অভাবই বিনাশের কারণ : প্রবল পরাক্রমশালী রাবণকে দশানন বলা হতো। দশানন মানে দশটি মাথা এরকম নয়। দশজন মানুষের আই কিউ রাবণের একটি মাথাতেই ছিল। সেজন্যই তাকে দশানন বলা হতো। রাবণ পুলস্ত্য মুনির নাতি, সংস্কৃত শাস্ত্র, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, বিমান শাস্ত্র, রসায়ন শাস্ত্রের মেধাবী বিদ্যার্থী ছিলেন। ভগবান শিব যাঁর গুরু, যিনি শিবতাণ্ডব স্তোত্রের রচয়িতা সেই মহাপরাক্রমশালী রাবণকে তার রাজ্যে গিয়ে একজন তপস্বী বধ করেছিল। প্রাপ্ত আর পর্যাপ্তের তত্ত্বের মধ্যেই রাবণের দুর্বলতা লুকিয়ে ছিল। সোনার লঙ্কায় বাস করেও রাবণের যা ছিল তাতে তার মনে হতো যা আছে তা পর্যাপ্ত নয়। আর গাছের ছাল পরিহিত, বনে বিচরণকারী পর্ণ কুটিরে বসবাসকারী শ্রীরামের মনে হতো যতটুকু আছে তা পর্যাপ্ত। শ্রীরামের কাছে চরিত্র ছিল কিন্তু সবকিছু থেকেও রাবণের কাছে চরিত্র ছিল না। শ্রীরামের কাছে নিজের পরিবার, সমাজের মূল্যবোধ রক্ষার মতো কর্তব্যবোধ ছিল। কিন্তু রাবণের কাছে সেই কর্তব্যবোধের ছিটেফোঁটাও ছিল না। পরিণামে রাবণ নিজের ও নিজ বংশের ধ্বংস ডেকে এনেছিল।

লোকচক্ষুর আড়ালেও প্রখর কর্তব্যবোধ : ত্রিলোকের পাঁচ- সাতজন সবচাইতে সুন্দরী নারীর মধ্যে একজন রাবণের বোন শূর্পণখা শ্রীরামকে প্রস্তাব দিয়েছিল এই জঙ্গলে কেউ দেখবে না সবার অলক্ষ্যে চলুন আমরা বিয়েটা সেরে নিই। গভীর জঙ্গলে শূর্পণখার এই কুপ্রস্তাব শ্রীরাম এই বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যে, মা, আমি বিবাহিত, সেজন্য এই প্রস্তাব কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এরপর শূর্পণখা একই প্রস্তাব লক্ষ্মণকে দিয়েছিল। রাম লক্ষ্মণ দুজনের কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর শূর্পণখা যখন মা সীতার উপর আঘাত আনতে যায় তখনই লক্ষ্মণ ওর নাক কেটে দিয়েছিল। যা কিনা রাবণকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল। এই ছিলেন শ্রীরাম যিনি কিনা সবার অলক্ষ্যে গভীর জঙ্গলে এই অশ্লীল অসংস্কারিত প্রস্তাবকে হেলায় ফিরিয়ে দিতে পারেন। সবার অলক্ষ্যেও নারীর সম্মান রক্ষার কর্তব্যবোধের এত বড়ো দৃষ্টান্ত খুব কমই পাওয়া যাবে। কিন্তু রাবণ? পঞ্চকন্যার একজন মন্দোদরীর মতো পত্নী ঘরে থাকতে তিনি এক বনবাসীর স্ত্রী বনে ঘুরছে খবর পেয়ে তাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। সেই ব্যাকুলতার ফলস্বরূপ নিজের ধ্বংস ডেকে আনলেন, সেই সঙ্গে নিজের জাত-কুল সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে দিলেন। সেজন্য এই ভোগ লালসাময় সময়কালের মধ্যে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমাদের কর্তব্যবোধ স্থির করতে হবে আমরা রাবণকে অনুসরণ করব না রামকে অনুসরণ করব।

সমাজকে উচ্চ মূল্যবোধ স্থাপনের কর্তব্যবোধ : জনকপুরীতে হরধনু ভঙ্গের পর শ্রীরামকে সবাই প্রস্তাব দিয়েছিল সীতার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার। উত্তরে শ্রীরাম বলেছিলেন যে পিতার অনুমতি ছাড়া তিনি এই বিবাহ করতে পারেন না। গুরু বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে বুঝিয়েছিলেন তোমার পিতার তিন বিবাহ। তুমি এখানে একটা বিয়ে করলে পরে পরবর্তীকালে পিতার অনুমতি নিয়ে আরও বিয়ে করতে পারবে। অযোধ্যার রাজপরিবারে একটি বিয়ে করার মর্যাদা রামচন্দ্রই প্রথম চালু করেন। সেইজন্যই তাকে মর্যাদা পুরুষোত্তম বলা হয়। সেদিন শ্রীরাম লক্ষ্মণকে বুঝিয়েছিলেন যে আমার মা কৌশল্যার কতই না কষ্ট হয়েছিল। আবার মা সুমিত্রা যখন এই পরিবারে এলেন তখন মা কৌশল্যা ও মা কৈকেয়ীর কতই না কষ্ট হয়েছিল। সেজন্য আমি একটিই বিবাহ করব। এই কথা শুনে সেদিন লক্ষ্মণও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনিও একটি বিবাহ করবেন এবং সমস্ত জীবন দাদার সেবা করবেন।

রামায়ণে প্রবীণদের সম্মান প্রদর্শনের কর্তব্যবোধ : রামায়ণে প্রবীণদের সম্মান প্রদর্শনের কর্তব্যবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। বানর সেনাদের সবাই যদি যুবক হতো এবং সেখানে যদি প্রবীণ জাম্বুবান না থাকতেন তাহলে হয়তো মা সীতার কাছে হনুমান পৌঁছাতেই পারতেন না। সাগরতীরে বসে যখন পরামর্শ হচ্ছে কে লঙ্কায় পৌঁছাবে মা সীতাকে খোঁজার জন্য। সেই ক্ষমতা বানর-ভল্লুক সেনাদের কারোরই ছিল না। জাম্বুবান জানতেন একমাত্র হনুমানই পারেন সেই কাজ করতে। কিন্তু সে অভিশাপগ্রস্ত হওয়ার জন্য তার সেই ক্ষমতা বিস্মৃত হয়েছে। কিন্তু স্মরণ করিয়ে দিলে আবার সে সেই ক্ষমতা ফিরে পেতে পারে। জাম্বুবান যখন হনুমানকে সেই ক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, তারপরেই কিন্তু হনুমানের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল লঙ্কায় গিয়ে মা সীতার খোঁজ করার। প্রবীণ জাম্বুবানকে সম্মান প্রদর্শনের কর্তব্যবোধ না থাকলে রামায়ণের ঘটনাক্রম হয়তো অন্যরকম হতে পারতো। রাবণের সঙ্গে যুদ্ধের সময় রামচন্দ্র যখন পেরে উঠছেন না, রাবণের অট্টহাসিতে কম্পিত হয়ে উঠেছিল যুদ্ধক্ষেত্র। সে সময় রাম অনুভব করলেন যে রাবণ দৈবী শক্তি দ্বারা সুরক্ষিত। তখন জাম্বুবানই শ্রীরামচন্দ্রকে বলেছিলেন রাবণের

দৈবীশক্তিকে নিজের পক্ষে আনার জন্য দেবীপূজা করতে হবে। শ্রীরামচন্দ্র বসেছিলেন পূজায়। আজ সেটাই অকালবোধন দুর্গাপূজা নামে প্রচলিত।

চরম সংকটে পুত্রের মঙ্গল কামনায় কর্তব্যবোধের প্রেরণা : বাল্মীকি রামায়ণে মাতা কৌশল্যা কাঁদতে কাঁদতে শ্রীরামকে বোঝাচ্ছেন— বনের পথে প্রকৃতি তোমাকে সর্পের হাত থেকে রক্ষা করুন, বরুণ তোমাকে রক্ষা করুন, ইন্দ্র তোমাকে রক্ষা করুন, মারুৎ তোমাকে রক্ষা করুন, এই সমস্ত দেবতার উদ্দেশ্যে আমি প্রতিদিন একটি করে প্রদীপ জ্বালাবো। সবশেষে যা বললেন সেখানটাই মায়ের প্রকৃত পরিচয়। শেষে মাতা কৌশল্যা বললেন তুমি যে পথে চলছো বনে গিয়েও সেই পথেই চলবে— ধর্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ। অর্থাৎ যে ধর্মকে তুমি রক্ষা করছো সেই ধর্মই তোমাকে রক্ষা করবে। চরম সংকটেও মাতা কৌশল্যা নিজ পুত্রকে কর্তব্যবোধের স্মরণ করিয়েছেন।

মায়ের প্রতি, ভাইয়ের প্রতি কর্তব্যবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত : বনগমনের পর মাতা কৌশল্যা রামকে দেখে ফিরে আসার পর বনে শ্রীরামের সেই ক্লেশক্লিষ্ট চেহারা দেখে রাতে আর ঘুমোতে পারছিলেন না। এদিকে ওই প্রাসাদেরই আরেক জায়গায় কাউকে একজন পায়চারি করতে দেখে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখলেন, ওখানে ভরতের স্ত্রী মাণ্ডবী পায়চারি করছে। মাতা কৌশল্যা ভরতের খোঁজ করাতে জানতে পারলো ভরত প্রাসাদে নেই। মাণ্ডবী বললো ভরত জানিয়েছে, দাদা যতদিন প্রাসাদ ছেড়ে কুটিরে বসবাস করবে সে নিজেও প্রাসাদ ছেড়ে কুটিরেই বসবাস করবে। দাদা যতদিন জুতো পরবে না সেও খালি পায়ে থাকবে। দাদার মতো সেও ভূমিশয্যায় জীবন অতিবাহিত করবে। মাণ্ডবী বলতে লাগলো, দূরে জ্বলতে থাকা আলো দেখিয়ে বলল ওই কুটির থেকেই তার স্বামী ভরত রাজকার্য পরিচালনা করছে এবং সে এখনো ঘুমিয়ে পড়েনি বলেই সে নিজেও ঘুমাতে যাচ্ছে না। মাতা কৌশল্যা মাণ্ডবীকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কেন ভরতের সঙ্গে ওই কুটিরে চলে গেলে না। এর উত্তরে মাণ্ডবী জানালো প্রাসাদে বড়োবধূ সীতা নেই সেজন্য তিন মাকে যত্ন নেওয়ার জন্য তাকে প্রাসাদে থাকতে দায়িত্ব দিয়েছে তার স্বামী। পরিবারে পারস্পরিক কর্তব্যবোধের এত বড়ো দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে?

রামের বনগমনের সময় ভরত তাঁর মাতুলালয়ে ছিলেন। ভরতকে বলা হয়েছিল জরুরি ভিত্তিতে অযোধ্যায় ফিরে আসতে। অযোধ্যায় ফিরে আসার সময় নন্দীগ্রামে রঘুবংশের পূর্বপুরুষদের একটা মন্দির ছিল। সেখানে পূজা দিতে গিয়ে ভরত দেখলেন সেখানটায় পিতা দশরথের মূর্তিও স্থাপিত রয়েছে। পুরোহিতকে প্রশ্ন করে জানতে পারলেন দশরথ আর এই পৃথিবীতে নেই এবং রামচন্দ্র বনবাসে চলে গেছেন। এই খবর পেয়ে ভরত কাঁদতে কাঁদতে অযোধ্যায় ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা জানলেন। এরপর পরিজনদের নিয়ে শ্রীরামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনার জন্য বনের দিকে রওনা দিলেন। শ্রীরাম যে ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে রাত্রি যাপন করেছিলেন, ভরত সদলবলে সেই ঋষির আশ্রমে রাত্রিযাপন করলেন। সকালবেলা উঠে যখন আবার যাত্রা করছেন তখন ভরতের মন বিষণ্ণ। ঋষি ভরদ্বাজ প্রশ্ন করছেন, রাজন্, আপনার মন এত বিষণ্ণ কেন? ভরত ঋষি ভরদ্বাজকে বললেন আমার মা এত বড়ো অন্যায় করেছে, অগ্রজ শ্রীরাম কি আমায় ক্ষমা করতে পারবেন? তখন ঋষি ভরদ্বাজ বললেন শ্রীরাম যেদিন আমার আশ্রম থেকে বেরিয়ে বনের দিকে যাত্রা করার পথে নদী পার হওয়ার সময় নদীর জল নিয়ে স্বস্তিবচন করছেন। পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করছে, জম্বুদ্বীপে ভরতখণ্ডে...। কিন্তু যখনই ভরত কথাটি শুনলেন শ্রীরামের হাত থেকে জল পড়ে গেল, হায় ভরত, হায় ভরত বলে কান্না করতে শুরু করলেন। তোমাকে শ্রীরাম এতটাই ভালোবাসে। শ্রীরাম করুণায় ভরা, সেজন্যই তাঁকে করুণানিধি বলা হয়।

শ্রীরাম যখন চিত্রকূটে পৌঁছালেন তখন বনদেবী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বলুন আমি আপনার কী সেবা করতে পারি? শ্রীরাম বনদেবীকে বললেন আমি এসেছি, আমি ফল ফুল খেয়ে নেব, আমি কুটির বানিয়ে নেব, এগুলো সব ঠিকই আছে কিন্তু আমি যে পথে এসেছি সেই পথের কাঁটাগুলো আপনি সরিয়ে দিন। বনদেবী বললেন আপনি তো সেই রাস্তায় চলে এসেছেন এখন কাঁটা সরালেই কী আর না সরালেই কী। শ্রীরাম বললেন আমি যে রাস্তায় এসেছি, আমাকে খুঁজতে খুঁজতে আমার ভাই ভরত সেই একই রাস্তায় আসছে, তার পায়ে যেন কাঁটা না বিঁধে। বনদেবী বললেন হ্যাঁ তা আমি করে দেব, কিন্তু আমার একটা ছোট্ট প্রশ্নের উত্তর দিন। যে পথে আপনি এসেছেন সেই পথে আসার সামর্থ্য কি আপনার ভাই ভরতের নেই? ভরত কি এতই দুর্বল যে কাঁটার ভয়ে সে এই পথে আসতে পারবে না? শ্রীরাম বললেন, না ভরত বজ্রের মতো মজবুত, সামান্য কাঁটা ওকে কী করবে? কিন্তু ওর পায়ে যদি একটি কাঁটাও বিঁধে যায় তাহলে এই ভেবে ওর হৃদয় কেঁদে উঠবে, আমার জন্য আমার দাদা শ্রীরামের পায়েও এরকম কাঁটা লেগে কতই না কষ্ট হয়েছে। ভ্রাতৃপ্রেমের এমন দৃষ্টান্ত বোধহয় আর দ্বিতীয়টি নেই।

বন্ধুর প্রতি বন্ধুর, নারী সুরক্ষার কর্তব্যবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত : মহাকাব্য রামায়ণে জটায়ু একটি ছোটো অথচ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। জটায়ু ও শ্রীরামের পিতা দশরথ ছিলেন পরম বন্ধু। জটায়ুর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে সীতামাতাকে বাঁচানোর জন্য আমরণ লড়াই করার জন্য। রাবণের সঙ্গে লড়াই করতে করতে ডানা হারিয়ে যেখানে বা যে এলাকায় জটায়ু আকাশ থেকে পড়ে যাচ্ছে, জটায়ুর এমন একটি ভাস্কর্য সেখানেই স্থাপন করা হয়েছে। কেরালার কোল্লাম জেলার চান্দায়ামাঙ্গালাম (পূর্বে জটায়ুমঙ্গলম)-এ জটায়ু আর্থ'স সেন্টার অবস্থিত। এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। ভাস্কর্যটি ২০০ ফুট দীর্ঘ, দেড়শো ফুট প্রশস্ত এবং ৭০ ফুট উঁচু।

মাতৃভূমির প্রতি অটুট কর্তব্যবোধ : রাবণ বধের পর লঙ্কার রাজসিংহাসন যখন শ্রীরামচন্দ্রের অধীন, তখন শ্রীরামচন্দ্রকে ভ্রাতা লক্ষ্মণ বলেছিলেন, অযোধ্যায় ফিরে না গিয়ে লঙ্কাপুরীতে থেকে যেতে। তখন শ্রীরাম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বলেছিলেন,

'অপি স্বর্ণময়ী লঙ্কা ন মে লক্ষ্মণ রোচতে।
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।।'

অর্থাৎ হে ভ্রাতা লক্ষ্মণ, লঙ্কা যতই ধনসম্পদে পরিপূর্ণ হোক না কেন। তবুও আমার কাছে আমার মা, আমার মাতৃভূমি, কর্মভূমি, জন্মভূমি অযোধ্যা নগরী আমার কাছে স্বর্গের থেকেও অধিক প্রিয়।

তাই তিনি ফিরে এসেছিলেন প্রজাদের সুখী করতে নিজের জন্মভূমি অযোধ্যাতে। তিনি ছিলেন এতটাই প্রজাবৎসল যে, প্রজাদের দুঃখে নিজের প্রাণ দিতেও পিছপা হতেন না। আমরা রামায়ণে পড়েছি কীভাবে প্রজাদের সুখের জন্য নিজের অর্ধাঙ্গিনীর প্রতি অগাধ প্রেম, বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও মা সীতাকে দিতে হয়েছিল অগ্নি পরীক্ষা, যেতে হয়েছিল বনবাসে।

অহংকার, আসক্তি, দাম্ভিকতা কর্তব্যবোধ ভুলিয়ে দিয়ে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়— ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণের মতো অজেয় যোদ্ধাদের মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়তে দেখেও রাবণের কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়নি। কারণ রাবণ ওই যুগের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান হলেও সে ছিল অহংকার, আসক্তি ও দাম্ভিকতার মূর্তিমান প্রতীক। ☐

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে জীবনব্রতের আদর্শ শিক্ষক

দীপক খাঁ

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ। সেই সময়েই সারা ভারত পরিভ্রমণ করে কন্যাকুমারী থেকে চেন্নাইয়ের এসেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বেদান্ত দর্শন সম্পর্কে স্বামীজীর চিন্তাধারা দাক্ষিণাত্যে বিশেষ করে চেন্নাইয়ে বিশেষ আলোড়ন তোলে। চেন্নাইয়ের অসংখ্য মানুষ স্বামীজীর ভক্ত ও অনুগামী হয়ে ওঠেন। চেন্নাইয়ের ভক্তদের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও চেষ্টাতেই স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোর বিশ্বধর্মসম্মেলনে যান।

স্বামীজীর বক্তব্য সেখানকার সব সম্প্রদায়, সব বয়সের মানুষের মনে গভীর অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে। চেন্নাই ও তামিলনাড়ু জুড়েই তাঁর প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখা যায় তা সত্যিই এক বিরলতম অধ্যায়। সেখানকার তরুণদের অবশ্যপাঠ্য হয়ে পড়ে স্বামীজীর পত্রাবলী ছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

রাধাকৃষ্ণনও স্বাভাবিকভাবে বিবেকানন্দের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হতে থাকেন। এরপর তার হাতে যখন স্বামীজীর ‘পত্রাবলী’ এসে পৌঁছায় তখন তিনি যেন অকূল সমুদ্রে কূল পেলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ড. রাধাকৃষ্ণন ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি বলেছিলেন, ‘শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্মেষণায় বহু শ্রেষ্ঠ প্রতিভার জন্ম দিয়েছে কলকাতা নগরী। কিন্তু সেসব প্রতিভার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি শুধু ভারতের নন, এই মহাদেশের আত্মার প্রতিভূ। আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁর পূর্ণতার প্রতীক তিনি। সেই আত্মিক শক্তিই ভক্তের সংগীত, ঋষিদের দর্শনে, সাধারণ মানুষের প্রার্থনায় অভিব্যক্ত।...সমস্ত মানুষের যন্ত্রণাকে যেন নিজের জীবনে অনুভব কছিলেন স্বামীজী। প্রতিটি মানুষ যাতে আপন অধিকারে বাঁচতে পারে, সুন্দর জীবনের অধিকারী হতে পারে, এটাই তিনি চেয়েছিলেন। সেটাই ছিল তাঁর জীবনসাধনা।’ আমাদের জীবনে এখনও তিনি প্রাসঙ্গিক। রাধাকৃষ্ণনের কথায় শুধু ভারত নয়, বিশ্ব আজ এক ক্রান্তিমুহূর্তে অবস্থান করছে। সর্বনাশের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছি এমন ধারণাও করছেন অনেকে। মূল্যবোধের বিকৃতি, নৈতিক মানের অবনতি, সবগ্রাসী নৈরাশ্য, সর্বজনীন উন্মত্ততায় পৃথিবী আজ দিশেহারা। হতাশায়, উদ্‌ভ্রান্তিতে, পরাজয়ে আমরা আজ অধঃপতিত। এই মুহূর্তে বিবেকানন্দই পথপ্রদর্শক হয়ে উঠতে পারেন। মানুষের আত্মাই সর্বোচ্চ, মানুষ অদ্বিতীয় অপূর্ব। শুধু আমাদের আশ্রয় রাখতে হবে তাতে। বিবেকানন্দ আমাদের যন্ত্রণার মধ্যে আশ্রয় দিয়েছেন, দুঃখের মধ্যে আশা দিয়েছেন, নৈরাশ্যের মধ্যে দিয়েছেন সাহস।

দিলীপ কুমার রায় মন্তব্য করেন, ড. রাধাকৃষ্ণন বিশ্বের কাছে ভারতের ধর্মতত্ত্বের মহিমার কথা প্রচার করেন, যেমন স্বামী বিবেকানন্দ করেছিলেন ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে। এই হলো ড. রাধাকৃষ্ণনের ওপর স্বামীজীর প্রভাব। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে একটি সভায় বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ দিলীপ কুমার রায়কে বলেছিলেন বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ। বলেছিলেন, ‘দিলীপ, আমরাও স্বাধীন দেশে এসেও কী আমাদের জাতীয় অগৌরব, লজ্জাহীনতা, ভীরুতা প্রচার করে আদর কুড়োতে ছুটব? ...এখানে এসে যদি ভারতের কথা বলতে হয় তবে আমরা যেন কেবল সেই সেই গুণ, সেই সেই সম্পদ, সেই সেই সাধনার কথাই বলি কাদের দৌলতে ভারত বড়ো হয়েছিল— যেমন বিবেকানন্দ বলেছিলেন। ...আমেরিকার ধর্মমহাসভায় দাঁড়িয়ে তিনি মাথা উঁচু করেই বলেছিলেন ভারতীয় ধর্মতত্ত্বের মহিমার কথা।’ এরপর দিলীপ কুমার রায়ের মন্তব্য : ‘তাঁর পরে স্বামী রামতীর্থ, রাধাকৃষ্ণন ও কবি নিজেও ঠিক এ কাজই করেছিলেন।’

রাধাকৃষ্ণন তাঁর ‘Our Heritage’ গ্রন্থে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে। বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। রাধাকৃষ্ণন ওই গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত পথে সাধনা করে বিবেকানন্দ বেদ উপনিষদ বিহিত এক উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হয়েছিলেন এবং বলতে পেরেছিলেন ‘আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই না যে সকল ধর্মমত সহ্য করার শক্তি আমার আছে। সে কথা বলার অর্থ ভগবানকে অপ্রমাণ করা। সকল ধর্মই আমার কাছে সমান ভাবে গ্রহণযোগ্য। যে ধর্ম আমাদের ভগবানের সান্নিধ্যলাভে এবং তাঁর স্বরূপ জানার কাজে সাহায্য করে সেই ধর্মই আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। এইরকম কোনো ধর্মকে অগ্রাহ্য করতে, প্রত্যাখান করতে আমি প্রস্তুত নই।’ রাধাকৃষ্ণন বলেন, ‘যেসব মানুষ এবং সমাজ ধর্মানুষ্ঠানও করে এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধেরও মার্জনা করে যেসব মানুষ ও সমাজকে ধর্মহীন বা অধার্মিক আখ্যা দেওয়াই উচিত।’

রাধাকৃষ্ণন মনে করতেন, উদার সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী, দরিদ্রনারায়ণের সেবাব্রত এবং ব্যক্তি জীবনের রূপান্তর ঘটানো জন্য ভগবানের আরাধনা--- জীবনব্রতের এই তিনটি সাধনাক্রমের শিক্ষাই আমরা স্বামী বিবেকানন্দের কাছে পেয়েছি। স্বামীজীর জীবন থেকে ত্যাগ, সংযম, অভয় ও সেবার আদর্শকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারলেই তাঁর দেওয়া শিক্ষার সাহায্যলাভ সম্ভব। ▯

সীতাকুণ্ড শুধু মন্দির নয়, এটি দেশের ঐতিহ্য

পত্র লিখছি সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ মন্দির নিয়ে। এটাই কপাল। নির্বাচন নিয়ে তো লিখেই যাচ্ছি, কী লাভ? প্লেটো বলেছিলেন, 'যেমন নাগরিক, তেমন দেশ'। আমি লিখলাম, 'যেমন গণতন্ত্র, তেমন ভোট'। না, এ লেখাটি নির্বাচন নিয়ে নয়, এটি চট্টগ্রামের ঐতিহ্যময় চন্দ্রনাথ মন্দির নিয়ে, অন্তত বছরে একটা দিন কিছু পুণ্য কামাই। আমার কথা না, একজন জহিরুল হক বাপি লিখেছেন, বছর দুই আগে কেউ একজন চন্দ্রনাথ মন্দিরে আযান দিয়েছিল। পুলিশ তাকে ধরেছে। এরপর কী হয়েছে জানা যায়নি। ক'দিন আগে ক'জনা মিলে সেখানে 'আল্লাহু-আকবর' স্লোগান দিল। এরপর একজন ফেইসবুকে চন্দ্রনাথ মন্দিরে 'বিফ বারবি-কিউ' ইভেন্ট দিল। আর একজন লিখল, এখন বাকি থাকলো শুধু ঢাকেশ্বরী মন্দির ও রমনা কালীমন্দির। এগুলো নির্বাচনের ঠিক আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা। এ ঘটনাগুলো একটির সঙ্গে আর একটি সম্পর্কিত এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সরকারের সিএসএ (সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট) এখানে অকেজো, কাজ করে না। প্রশাসন এসব দেখে না। সীতাকুণ্ডের এমপি, যিনি দুইবার নির্বাচিত, এবারও আগের দুই বারের মতোই নির্বাচিত হয়েছেন, তিনি সীতাকুণ্ডের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অনেকের সন্দেহ তিনি মন্দিরটি উৎখাতের চেষ্টা করছেন। একটি ভিডিয়োতে দেখলাম, তিনি ওকথা অস্বীকার করেছেন।

সীতাকুণ্ডের ইতিহাস লিখছি না, তবে ফাল্গুন মাসে শিব- চতুর্দশীতে এখানে বিশাল মেলা হয়। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা থেকে এবং দেশের মানুষ মিলে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। সম্ভবত সেময় সীতাকুণ্ডে ভালো ব্যবসা জমে। বিশ্ব এখন ব্যবসার জন্যে উন্মুক্ত। সীতাকুণ্ডে এই ব্যবসাটা যাতে আরও ভালো জমে, বুদ্ধিমান মানুষ সেই চেষ্টাই করবে। সকলের বোঝা উচিত, এই ইন্টারনেট যুগে সীতাকুণ্ডের মতো মন্দির দখল করা সহজ কাজ না।

আফগানিস্তানে 'বামিয়ান' মন্দির ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে। সীতাকুণ্ড শুধু মন্দির নয়, এটি বাংলাদেশের ঐতিহ্য, হিন্দুদের একটি তীর্থক্ষেত্র। এটি রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব। বিমানের স্লোগান, 'ছোটো হয়ে আসছে পৃথিবী'। আপনার হাতের মুঠোয় ইহুদিদের তৈরি 'সেলফোন' সকল অপকর্ম বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেবে, দিচ্ছে। ইহুদি-নাসারাদের তৈরি 'ফেইসবুক'-যা দিয়ে আপনি ঢাকেশ্বরী-রমনা কালীবাড়ি দখল করতে চাইছেন, তা কিন্তু আপনাকে 'হাজতবাস' নিশ্চিত করে দিতে পারে। তাই ভালো হয়ে যান, আপনার ধর্ম আপনি পালন করুন, অন্যকে তাঁর ধর্ম পালন করতে দিন। আজ এই পৃথিবীতে আটশো কোটি মানুষের বাস, সেখানে আপনি সংখ্যালঘু। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেছিলেন, বর্ডারটা পেরুলেই আপনি সংখ্যালঘু, সুতরাং সংখ্যাগুরুর বড়াই বা ক্ষমতা না দেখানোই ভালো। সীতাকুণ্ডকে হিন্দুর মন্দির হিসেবে না দেখে দেশের সম্পদ হিসেবে দেখুন। সীতাকুণ্ডে বসবাসকারী আপনার প্রতিবেশীকে হিন্দু হিসেবে না দেখে প্রতিবেশী হিসেবে দেখুন। পৃথিবীটা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জায়গা। প্রতিবেশীর সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হয়, বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়াতে হয়, নইলে সমস্যা বাড়ে বই কী।

চন্দ্রনাথ মন্দির সমস্যার আশু সমাধান হোক। সরকার সদিচ্ছা না দেখালে হিন্দুদের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, পাশে অবশ্যই ভালো মুসলমানদের পাবেন। দেশে চন্দ্রনাথ মন্দিরে গোমাংস দিয়ে বারবিকিউ করার মানুষ যেমন আছে, জহিরুল হক বাপি'র মতো মানুষও আছেন। শুভশক্তি একত্রে দাঁড়ালে অশুভ-শক্তি পালিয়ে যায়। একাত্তর এর বড়ো প্রমাণ।

—শিতাংশু গুহ,
নিউইয়র্ক।

বিদেশি বধূদের ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিক আইন হোক

ভারতে দ্বৈত নাগরিকত্ব পাওয়ার আইন নেই। এর ফলে কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা যায়। যেমন কোনো বিদেশি মেয়ে বিয়ে করে ভারতে স্বামীর সঙ্গে থাকে তখন ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য তাকে নিজের জন্মভূমির নাগরিকত্ব ছাড়তে হয়, পরে অনেক চেষ্টার পর ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়া যায়। এখানে আমাদের একটি কথা মনে রাখা দরকার। বিদেশি মেয়ে যখন তার জন্মভূমির নাগরিকত্ব ছাড়তে হয় তখন তার খুব কষ্ট হয়। ভাবাবেগ জেগে উঠে, যে জন্মভূমিতে জন্ম থেকে অনেক বছর অতিবাহিত করেছে সেটি বিদেশ হয়ে যাচ্ছে! মেয়ের মা, বাবা, ভাই, বান্ধবী ও আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে একধনের বিচ্ছিন্নতা ঘটে যাচ্ছে। তাই বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভেবে বিদেশি বধূদের দ্বৈত নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন বিদেশ মন্ত্রকের কাছে অনুরোধ রাখছি। উল্লেখ্য, বিশ্বের ৪৯ শতাংশ দেশে দ্বৈত নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন আছে। দ্বৈত নাগরিকত্বের অধিকারীদের Bipatrides বলা হয়।

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী এবং 'লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ'

স্বস্তিকা ৭৬ (১৩), ২০২৩ সংখ্যায় ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদ নিবন্ধের নিবিড় পাঠ করেছি। স্বামীজীর একটি বাণী উদ্ধৃত করে শোনা যায়, তিনি গীতা পাঠের বিরুদ্ধে ছিলেন। এটা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের একটি রোগ। স্বামীজী কখোনোই গীতা পাঠের বিরোধিতা

করেননি। ১৯০০ সালের ২৬, ২৭ ও ২৯ মে সান ফ্রানসিসকোতে গীতা প্রসঙ্গে তিনটি বক্তৃতা দেন। স্বামীজী গীতার মহাভারত-সমসাময়িকত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। মাদ্রাজে 'ভারতীয় মহাপুরুষ গণ'শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি বলেন, গীতা না পড়লে কৃষ্ণচরিত্র কখনোই বোঝা যাবে না। কারণ গীতার প্রচারক তাঁর নিজের উপদেশের মূর্তিমান বিগ্রহ। স্বামীজী শ্রীকৃষ্ণকে সমগ্র ভারতের নেতা বলেছেন। অহিংসা পরমো ধর্মঃ— এই অজুহাতে অর্জুন যখন যুদ্ধ করতে অনীহা প্রকাশ করেন শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনকে কাপুরুষ ও কপট বললেন--- স্নেহ ভালোবাসাবশত দেশেরও রাজার প্রতি কর্তব্য ভুলে গেছিলেন, উঠে দাঁড়াও, ধর্ম রক্ষায় যুদ্ধ কর। 'ন্যায় ও ধর্ম রক্ষাই রাজার কর্তব্য।'

স্বামীজীর অজস্র লেখা, বক্তৃতা ও চিঠিপত্র থেকে তাঁর শ্রীমদ্‌ভগবতগীতার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্‌ভগবতগীতার ১০ম অধ্যায়ের ২০তম শ্লোকে বলা হয়েছে, 'অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ। অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামান্ত এব চ।।' অর্থাৎ এটা প্রমাণ করে মানুষে মানুষে সমভাব সমদর্শন ও অহিংসাই সনাতন দর্শন।

কয়েকদিন আগে কলকাতা ব্রিগেডে লক্ষ কণ্ঠে শ্রীমদ্‌ভগবতগীতা পাঠ সম্পন্ন হয়ে গেল। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশিত হলো নজরুল গীতির মাধ্যমে। গীতার মূল দর্শন সর্বভূতে একই আত্মা বিরাজিত। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী বলে প্রচারিত অসত্যের অপনোদন ঘটেছে।

—রবীন্দ্রনাথ রায়,
সাহেব হাট, রাশিডাঙ্গা।

ফার্স্ট জানুয়ারি কলোনি কালচার হিসেবে পাওয়া একটা উপহার

পূজা কার্নিভাল থেকে গঙ্গাসাগর, বড়দিন থেকে ফার্স্ট জানুয়ারি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, ঐক্যের মধ্যে বিচিত্র স্বাদের মিলন মেলা বলা যায়। ইংরেজি পুরাতন বছর শেষ হয়ে যায়। এক এক করে বছরের সঙ্গে সব অনুষ্ঠানও শেষ হয়। নতুন বছর আসে নতুন স্বপ্ন নিয়ে। নতুন বছর আসে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে সওদা ফেরি করতে। স্বপ্ন দেখে মন। নতুন বছর শুরু ২০২৪-এর ফার্স্ট জানুয়ারি থেকে রাতের বর্ষ পালনের মধ্যে দিয়ে। নতুন করে পথ চলা শুরু। অতীতকে অতিক্রম করে সামনের দিকে পথ চলা শুরু।

দেশে-দেশে যুদ্ধ, মারণাস্ত্র, রক্তপাত, চোখের জল অনেক দেখেছে এ বঙ্গ। রাজ্য-দেশ, রাজ্য-রাজনীতি টলমল, কর্মহারা শ্রমিক, চাকরি প্রার্থীদের হাহাকার, বেকার যুব সমাজ, দুর্গার কান্না রাতের অন্ধকারে শোনা যায়। এ রাজ্য কেশব নাগের সেই পিতা-পুত্রের অঙ্কের মতো মেলানো খুব কঠিন। পিতার বয়স বেশি না পুত্রের বয়স বেশি? এখানে শুধু পিতার থেকে পুত্রের বয়স বেশি হয়ে যায়। বয়স বেড়ে যায়। তাই চাকরি মেলে না। নতুন বছরের স্বপ্নপূরণ অধরা থেকে যায়। তবুও আমরা বর্ষ পালনের আনন্দে উদ্দেশ্যহীনভাবে রাতের রাস্তায় এলোমেলো হেঁটে ভিড় জমাবো। এর নাম নববর্ষ পালন, 'আনন্দ নেবে শুধু লুটি লুটি।' বাহ্! বিদেশিদের বর্ষ পালন। বৈচিত্র্যের মধ্যে স্বাদ একেই বলে! বিদেশিদের কাছ থেকে কলোনি কালচারের মতো উপহার হিসেবে পেয়েছি ফার্স্ট জানুয়ারি। ভালোবাসার কুকুরের গলায় চেইন বাঁধার কালো দাগের মতো এই উৎসব ফার্স্ট জানুয়ারি। মৃত্যু পর্যন্ত দাসত্বের এই কালো দাগ বহন করে চলেছে বাঙ্গালিবাবুরা।

—সুবল সরদার,
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

দুর্বৃত্তের পাশে দুর্বৃত্তরা

সরকারি তদন্ত অধিকারীদের আক্রমণ করে রক্তাক্ত করা শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে কেন্দ্র সরকারের লুক আউট নির্দেশ জারি হলো। দক্ষিণবঙ্গের সবাই জানেন রোহিঙ্গা অধ্যুষিত সন্দেশখালির সরবেড়িয়ার তৃণমূল নেতা এলাকার নামকরা গুন্ডা। মানুষ ভয়ে তার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে না। ইডি আধিকারিকদের আক্রমণ করার পর তৃণমূলের এক নেতা ও এক নেত্রী সাফাই গেয়েছেন যে, ইডি আধিকারিকেরা সেখানকার মানুষদের উত্ত্যক্ত করেছিলেন। সেজন্য মানুষ তাদের আক্রমণ করেছে। তাদের দলের আর এক চোর তথা দলের মুখপাত্র বলছেন, ইডি আধিকারিকরা রাজ্য সরকারকে না জানিয়ে তদন্ত করতে গিয়েছিলেন। তাহলে তাদের দলের যে রাঘববোয়ালরা এখন জেলে রয়েছেন, তাদের বেলায় কি রাজ্য সরকারকে জানিয়ে তদন্ত হয়েছিল? রাজ্য সরকারকে জানিয়ে তদন্ত হলে তো পাখি খাঁচা ছেড়ে পালিয়ে যাবে যাবে। আবার প্রমাণ হলো যে, দুর্বৃত্তের পাশেই রয়েছে দুর্বৃত্তরা।

—সুখময় নাথ,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা।

পশ্চিমবঙ্গ কি পাকিস্তান হতে চলেছে?

দিদির দুধেল গাইয়েরা কেন্দ্রীয় সরকারি তদন্ত সংস্থার আধিকারিকদের রক্তাক্ত করেছে। সশস্ত্র দেহরক্ষীরা ভয়ে পালিয়ে গেছে। উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি ব্লকের রোহিঙ্গা মুসলমান অধ্যুষিত সরবেড়িয়ার ঘটনার পরও পশ্চিমবঙ্গবাসীর চোখ খুলবে না? আগামী ২০২৬ সালে বর্তমান শাসকদলকে যদি ক্ষমতাচ্যুত না করতে পারা যায়, তাহলে বড়োই দুঃসময়ের দিন দেখতে হবে। রাজ্যের বর্তমান শাসকদলের আমলে পশ্চিমবঙ্গ কি পাকিস্তান হতে চলেছে— এই প্রশ্ন এখন সবার মুখে মুখে ঘুরছে।

—সদানন্দ হালদার,
বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা।

With Best Compliments From-

A Well Wisher

আজও বাল্যবিবাহ চলছে আইনের আড়ালে

অঞ্জলি চৌধুরী

ইদানীংকালে নারীর নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে বেশ কিছু আইন পাশ হয়েছে, যাতে মহিলারা নিরাপদে থাকতে পারে, তাদের ওপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া না হয়— তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ যেন গড়ে উঠতে পারে। নারী সুরক্ষা আইনে মহিলামহলে এক স্বস্তির নিঃশ্বাস, আশ্বস্ত হওয়ার বিশ্বাস জেগেছিল। কিন্তু এত বড়ো রাজ্যে কোথায় কী ঘটছে তা কি সবাই জানতে পারে বা জানলেও কি তার কোনও সুবিচার হয়? হয় না। না হলে শিউরে ওঠার মতো নাবালিকা মেয়েদের ওপর এত বড়ো নির্মম অত্যাচার চালাতে পারে গ্রামের মানুষজন! অত্যাচার তো বটেই, নিজস্ব স্বাধীনতাকে পিষে মেরে জোর করে বিয়ে দিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া মানেই তো গলা টিপে গণতন্ত্রকে মেরে ফেলা।

আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় মেয়েদের পড়াশোনা শিকেয় তুলে তাদের বিয়ের পিঁড়িতে জোর করে বসাচ্ছে তাদের বাবা-মা। কিছুদিন পর অর্থাৎ বছর ঘুরতে না ঘুরতে বালিকা কন্যার রূপান্তর ঘটে মা'র ভূমিকায়। তখন তার একমাত্র কাজ হয় সন্তান পালন ও সংসার জীবন। ভবিষ্যতের সব স্বপ্ন শেষ হয়ে যায়। অভিভাবকরা নিরক্ষর হলেও এই সুসভ্য সমাজের বিচক্ষণ মানুষরা বোঝাবেন এবং বাল্যবিবাহ আজকের দিনে কঠোর অপরাধ— শুধু তাদের ভবিষ্যতের পড়াশোনা বন্ধের জন্য নয়, আঠারো বছরের আগে সন্তান ধারণ করা এবং জন্ম দেওয়া তার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, তাও চোখে পড়ছে না। তাঁরা যদি সব জেনেও মদত দেন, তাহলে অভিভাবকদের অপরাধ কোথায়? এই যে বিভিন্ন গ্রামের যে সব মেয়েকে এভাবে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদের অভিভাবকদের একটাই কথা— মেয়ে হয়ে জন্মেছে যখন বিয়ে তো দিতেই হবে। ভালো ছেলে পেলে কেন বিয়ে দেব না! আসলে তাদের অভিধানে মেয়েদের জীবনে 'বিয়ে' হলো শেষ কথা।

কয়েক বছর আগে একটি লোমহর্ষক ও নৃশংস ঘটনা জানা গিয়েছিল। খানাকুলের পোল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁটাপুকুর গ্রামে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রওশনারা বেগম মাধ্যমিকের আগে বিয়ে করতে রাজি ছিল না, তাই বাবা-মা'র ঠিক করা পাত্রের সঙ্গে বিয়েতে নারাজ হওয়ায় তাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে বাবা-মা ও দিদিমা।

ঘটনাটি মুসলমান পরিবারে। পাড়াপ্রতিবেশী থানায় গিয়ে অভিযোগ জানিয়েছি। নারী সুরক্ষা আইন তৈরি হচ্ছে, অথচ নারীরা আজও নিরাপত্তার অভাবে ভুগছে। না হলে বীণা কালিন্দীদের মতো কিছু নির্ভীক কন্যা বাবা-মা'র পছন্দ করা পাত্রের সঙ্গে বিয়ের আসন থেকে উঠে এসে সোজা থানায় গিয়ে অভিযোগ জানায়। তাদের স্বপ্নকে চুরমার করতে বাবা-মা যে অন্যায় করছে, তার প্রতিবাদ করতে তারা এতটুকু বিচলিত হয়নি। তাই তো তৎকালীন মহিলা রাষ্ট্রপতি অসমসাহসী ক'জন কন্যাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সংবর্ধিত করেন। কিন্তু সেই বীণা কালিন্দীও শেষমেশ পারল না তাদের জেদ ধরে রাখতে। আসলে সমাজের অনুশাসনে তারাও বিয়ের আসনে বসতে বাধ্য হয়েছিল। জানি না তাজের জীবনের পরিণতি আজ কোথায়?

সমাজে একটা সময়ে শিক্ষার আলো এসে যখন পড়েনি তখন মেয়েদের জীবনে 'বিয়ে' ছাড়া কিছুই ছিল না। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতিতে সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে মেয়েরা এগিয়ে গেছে। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতেও গ্রামের মেয়েদের ওপর এহেন নির্বিচারে অবদমন কি চিন্তা করা যায়! তবে এটা ঠিক যে, সমাজের, ওপরতলার কর্তাব্যক্তিরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মোড়লি করতে গেলেও আজও কিছু প্রকৃত শিক্ষিত মানুষের উদারদৃষ্টিতে ধরা পড়ছে এই অন্যায় অবিচার এবং তাঁদের নেতৃত্বে তুলে ধরা হচ্ছে এহেন বহু ঘটনা। তাঁদের মধ্যে বীরভূম জেলার নওগাঁ বিলসা উচ্চবিদ্যালয়ের ইতিহাসের সংলাপ বিশ্বাস। ভাবতেও দুঃখ হয় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সমাজের কুপ্রথা-সংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশব সেনের মতো সমাজ সংস্কারকরা, আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন বাল্যবিবাহ-র মতো কু-প্রথাকে বন্ধ করার জন্য। কিন্তু স্বাধীনোত্তর পর্বে একবিংশ শতাব্দীর মতো সময়ে তলে তলে চলছে বাল্যবিবাহের হিড়িক অশিক্ষিত সমাজে।

সংলাপ বিশ্বাসের মতো ওই বিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষকরা সম্মিলিতভাবে অজ্ঞ, অশিক্ষিত অভিভাবকদের বাল্যবিবাহের কুফল বোঝানোর জন্য কর্মশালার ব্যবস্থাও করেছেন। তাঁদের কাছ থেকে মতামত নিয়েছেন। কিন্তু অজ্ঞতার অন্ধকারে থাকা অভিভাবকদের একটাই কথা— চিরদিনই এইভাবে চলে এসেছে। আমাদের সংসারে যারা অল্পবয়সে বিয়ে হয়ে এসেছে বা যাদের অন্য পরিবারে বিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা কি কেউ খারাপ আছেন! প্রকৃত অর্থে, যে যতই বোঝাক না কেন, প্রশাসনিক স্তর থেকে যদি সচেতন করার চেষ্টা না থাকে, তাহলে এরা অন্যের কথা মানবে কেন? দুঃখ এটাই যে, আমরা একদিকে পা ফেলে এগোচ্ছি বটে, কিন্তু মনের দিক থেকে এক পা পিছনে হাঁটছি।

ট্যারা চোখের সমস্যা ও সমাধান

ডাঃ পার্থ চৌধুরী

ট্যারা চোখ কীসের অভাবে হয়

ট্যারা চোখ-জনিত সমস্যার প্রধান কারণ হলো : ১. আয়রনের অভাব, ২. আয়োডিনের অভাব, ৩. ভিটামিন এ-এর অভাব, ৪. প্রোটিনের অভাব।

লক্ষ্মী-ট্যারা মানে কী?

চোখের এ ধরনের সমস্যাকে সাধারণত 'ট্যারা চোখ' বা 'লক্ষ্মী ট্যারা' বলা হয়। সামান্য বাঁকা চোখ দেখতে সুন্দর মনে হয়, তাই একে লক্ষ্মী ট্যারা বলা হয়। আমাদের অক্ষিগোলকের চার পাশে কিছু মাংসপেশি রয়েছে, যা স্নায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে চোখের অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করে।

ট্যারা শব্দের অর্থ কী?

ট্যারা শব্দটির উৎপত্তি প্রাচীন গ্রিক শব্দ 'টেরাস (teras) থেকে, যার অর্থ 'দানব'। ১৯৬০ সালে উপসর্গটি আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতিতে স্বীকৃত হয়।

চোখ ট্যারা কেন হয়?

আমাদের দুটি চোখে ছ'টি করে পেশি থাকে। এই পেশিগুলির ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে এই সমস্যা দেখা যায়। আমাদের দুটি চোখের দৃষ্টিরেখা (ভিসুয়াল অ্যাক্সিস) সাধারণত সমান্তরাল থাকে। এই ক্ষেত্রে দুটি চোখে আলাদা ইমেজ তৈরি হয়।

কীভাবে বুঝবেন কারো চোখ ট্যারা হয়ে যাচ্ছে কিনা?

যখন কেউ দু'চোখে একসঙ্গে দেখতে পাবেন না, তখন বুঝতে হবে চোখে কোনোরকমের সমস্যা রয়েছে। আমাদের দুটো চোখ সবকিছুই দুটো দেখে থাকে এবং দুটি প্রতিবিম্ব মস্তিষ্ককে একটি প্রতিবিম্বে রূপান্তরিত করে দেয়। ফলে আমরা দু'চোখ দিয়ে দুটি আলাদা জিনিস না দেখেও একটা জিনিস দেখে থাকি।

প্রতিরোধ ও প্রতিকার

পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে সব শিশুর চোখ পরীক্ষা করা দরকার। কখনও কারও চোখে একটির চেয়ে অন্যটি কম দেখতে পেলে অকুলোপ্লাষ্টি সার্জেনের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

একটি বস্তুকে দুটি অথবা ঝাপসা দেখলে অকুলোপ্লাষ্টি সার্জেনের সাহায্য নেওয়া উচিত।

পড়াশোনা করার সময় মাথাব্যথা করলে দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা করা উচিত।

যে কোনো রোগীর ট্যারা চোখ হলে চিকিৎসার মাধ্যমে সারানো সম্ভব।

একটি চোখ বন্ধ করে, চোখে পাওয়ার চেক করে চশমা দিয়ে চোখের ব্যায়াম করে, চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শে ট্যারা চোখ সারানোর চেষ্টা করা যায়।

যখন দুই চোখ একসঙ্গে দেখতে পারে না এবং একটা চোখ আরেকটা চোখ থেকে দূরে যায় বা বেঁকে যায়, সেই চোখকে ট্যারা চোখ বলে। সব সময় বাঁকা বা কখনও কখনও বাঁকা চোখ সামাজিকভাবে একজনকে হেয় প্রতিপন্ন করে।

ট্যারা চোখ শারীরিক বিভিন্ন ত্রুটির মধ্যে অন্যতম একটি ত্রুটি। কোনো বস্তুকে সঠিকভাবে দেখতে হলে একটি চোখকে সমানভাবে ওই বস্তুর দিকে স্থির রাখতে হয়। কিন্তু জন্মগত কারণে চোখের মাংস দুর্বল হলে, মণি অস্বচ্ছ হলে, জন্মগত ছানি হলে, দুই চোখের দৃষ্টিশক্তির পার্থক্য হলে, প্রধানত অসামঞ্জস্য হলে দুটি চোখ একসঙ্গে কোনো বস্তুর দিকে স্থির থাকতে পারে না। দুটি চোখের কোনোটি নাক অথবা কানের দিকে বেঁকে যায়।

ট্যারা চোখ শুধু সামগ্রিক কাজকে ব্যাহত করে না, সৌন্দর্যহানির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিকভাবে বিবাহবন্ধন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান, সরকারি চাকরি প্রাপ্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে হেয় প্রতিপন্ন করে। □

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গে বিকল্প শিক্ষক আন্দোলনের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন

বাপী প্রামাণিক

স্বাধীনতার পর থেকে ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদের দায়িত্ব কর্তব্যের সঙ্গে অধিকারের সমতা বিধান দেখা যাচ্ছে না। এই রাজ্যের শিক্ষকদের বেশিরভাগ সংগঠন শুধুমাত্র শিক্ষকদের অধিকারের কথা বলে, শিক্ষা ব্যবস্থার অথবা শিক্ষকদের দায়িত্ব কর্তব্যের কথা বলে না। যদিও শিক্ষকদের প্রতি সমাজ শ্রদ্ধাশীল ছিল, আদর্শ শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্মান সমাজে এখনো আছে। এই রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান পরিস্থিতি ভয়ানক।

এই সমস্যার কারণ কী এর পর্যালোচনা করার সময় এসেছে। শিক্ষা ব্যবস্থার মূল কাণ্ডারি শিক্ষক এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু আজকাল শিক্ষকরা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দলীয় রাজনীতি ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে দায়িত্ব নিতে ভয় পান, বেশিরভাগ শিক্ষক দলীয় রাজনীতির শিকার। শিক্ষকরা শিক্ষা ব্যবস্থার মূল সিদ্ধান্তের জায়গা থেকে অনেক সরে গেছেন। শিক্ষকতা পেশা হয়ে গেছে; ব্রত আর নেই। যদিও শিক্ষকদের এই চিন্তাভাবনার বর্তমান অবস্থা হঠাৎ করেই চলে এসেছে তা নয়, এই রাজ্যের শ্রমিক, কর্মচারীদের মতো শিক্ষকদের বিভিন্ন সংগঠনের মূল কর্মপদ্ধতি, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, আন্দোলনের স্বরূপ, দাবি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাঁরা নিজেদের পেশাগত দাবির বাইরে একটা কথাও বলছেন না। শিক্ষা ব্যবস্থাকে কীভাবে পরিচালনা করবেন, শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হবে, পঠনপাঠন, সিলেবাস নিয়ে বেশিরভাগ সংগঠনের মাথাব্যথা নেই। এই সমস্ত কারণে বর্তমানে এই রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার এক কলঙ্কিত অধ্যায় সামনে এসেছে। শিক্ষাব্যবস্থায় রাজনীতি, দুর্নীতি, ধর্মীয় তোষণ, শিক্ষকদের ওপর নানারকম আক্রমণ নেমে এসেছে। সমাজ আর শিক্ষকদের বিশ্বাস করছে না, শিক্ষকরাও সমাজ থেকে অনেক দূরে চলে গেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সামাজিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হয়ে গেছে।

এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির উপায় কী? এর উত্তর খোঁজার দিন এসেছে। শিক্ষক ও সমাজের মধ্যে কর্তব্য না অধিকারের, পেশা না ব্রতের কোন পথ সঠিক অথবা এই দুয়ের মধ্যে সমতা বিধান কীভাবে করা যায় তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এই রাজ্যের বেশিরভাগ শিক্ষক সংগঠন শুধুমাত্র পেশাগত দাবির কথা বললেও অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ শিক্ষক সংগঠন প্রায় বিশ বছর ধরে একটি আদর্শকে সামনে রেখে কাজ করে চলেছে। এই সংগঠনের আদর্শ হলো রাষ্ট্র হিতে শিক্ষা, শিক্ষা হিতে শিক্ষক, শিক্ষক হিতে সমাজ। সহজভাবে বললে রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য শিক্ষার প্রয়োজন, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য শিক্ষকরা কাজ করবেন বা দায়িত্ব পালন করবেন, আর শিক্ষকরা যদি শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য কাজ করেন তাহলে সমাজও শিক্ষকদের কল্যাণে পাশে থাকবে। এই সুন্দর ত্রিসূত্রের মধ্যেই বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের ঘুণধরা শিক্ষা ব্যবস্থার সমাধানের সন্ধান রয়েছে। এই সংগঠন শুধুমাত্র এই রাজ্যে নয়, গোটা দেশের বৃহত্তম সংগঠন হিসেবে এই আদর্শকে সামনে রেখে কাজ করে চলেছে। শিক্ষকদের নিজেদের পেশাগত দাবি আদায়ের পাশাপাশি আদর্শের কথা কর্তব্যের কথা স্মরণ করায়। তার জন্য এই সংগঠন প্রতি বছর তিনটি স্থায়ী কার্যক্রম করে, তার মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো 'কর্তব্যবোধ দিবস'।

এই কর্তব্যবোধ দিবস ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন থেকে ২৩ জানুয়ারি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম দিনের মধ্যে করা হয়। এই কার্যক্রমে শিক্ষকদের আদর্শ, কর্তব্যকর্ম, নীতি, মূল্যবোধ, রাষ্ট্রের ও সমাজের জন্য তাদের ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়। এর ফলে শিক্ষকদের মধ্যে অধিকার বোধের পাশাপাশি কর্তব্যবোধের জাগরণ হচ্ছে। এই সংগঠন বিকল্প শিক্ষক সংগঠন হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে ধীরে ধীরে শিক্ষকদের মধ্যে একটা নতুন পথের সন্ধান দিতে শুরু করেছে। এই সংগঠন বিকল্প আন্দোলন পদ্ধতির মাধ্যমে নিজেদের অধিকার অর্জন করবে সমাজকে সঙ্গে নিয়ে। সমাজের মধ্যে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে, শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা এবং সম্মান ফিরিয়ে আনতে গুরুবন্দন কার্যক্রম করা হয়। শিক্ষকদের সম্পর্কে সমাজের মধ্যে নতুন করে শ্রদ্ধা তৈরি করতে পারলে, শিক্ষা ব্যবস্থা দলীয় রাজনীতির বাইরে বের করতে পারলে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার পুরো দায়িত্ব শিক্ষকদের ওপর ন্যস্ত করাতে পারলে আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা ঠিক পথে চালিত হবে। এই বিকল্প শিক্ষক আন্দোলন যত বিস্তার লাভ করবে ততই এই রাজ্যের মঙ্গল, কারণ এটাই সঠিক পথ। দেশ সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে একটা বিশ্বাস, কর্তব্য, অধিকারের মধ্যে সুসামঞ্জস্য সমতা বিধান ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। একমাত্র এই বিকল্প সংগঠনই পারে, তাদের ত্রিসূত্রী আদর্শের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে এবং শিক্ষকদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে।

স্বামীজী ও নেতাজীর জীবনাদর্শের প্রেক্ষিতে শিক্ষক সমাজের কর্তব্য

তারাশঙ্কর চক্রবর্তী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেনের প্রাণে এনে দিয়েছিলেন 'আগুনের পরশমণির' স্পর্শ আর সুভাষ পেয়েছিলেন স্বামীজীর কাছ থেকে 'নেতাজী' হওয়ার অগ্নিমন্ত্র। স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই দুই মহাপুরুষ যাঁরা দেশমাতৃকার শ্রীচরণে সর্বস্ব উৎসর্গ করেছেন। এরকম মহান কাজের মাধ্যমে তাঁরা যে কর্তব্যবোধের সুমহান দৃষ্টান্ত ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে স্থাপন করেছেন, তা সকল ভারতবাসীর নিকট অনুপ্রেরণা স্বরূপ।

এই দুই মহাপুরুষের জন্মজয়ন্তীর মধ্যবর্তী কালখণ্ডে, ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ জাতীয়তাবাদী শিক্ষক সংগঠন 'অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ' এই দুই মহান মানুষের জীবন কাহিনিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যই 'কর্তব্যবোধ দিবসের কার্যক্রম' পালন করে থাকে। ভারতবর্ষে যত শিক্ষক সংগঠন আছে তার মধ্যে একমাত্র 'অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ' এই পরম পবিত্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এইরূপ কার্যক্রম পালন করে থাকে। এই সংগঠনের প্রধান তিনটি আবশ্যিক কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম এটি। এই কার্যক্রমে সকল স্তরের শিক্ষানুরাগী মানুষকে আসার জন্য আগ্রহ করা হয়। এখানে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য বা সন্তানের প্রতি তাঁদের কর্তব্য, শিক্ষক-ছাত্রের পারস্পরিক কর্তব্য, গুরুজনদের প্রতি কর্তব্য, পরিবার-সমাজ-দেশের প্রতি কর্তব্য বিষয়ে সুন্দর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হয়ে থাকে।

'অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ' সংগঠনের এই নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে এই সংগঠন সমগ্র দেশের মঙ্গলের জন্য এবং শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সকল স্তরের মানুষের সংগঠন। এই সংগঠনের মূল মন্ত্র হলো, দেশের মঙ্গলের জন্য শিক্ষা, শিক্ষার মঙ্গলের জন্য শিক্ষক এবং শিক্ষকের

বেণীমাধব দাস

মঙ্গলের জন্য সমাজ। সংগঠনের ধ্যেয়বাক্য বা মূল মন্ত্র পাঠ করলেই বোঝা যায়, এই সংগঠন শুধুমাত্র শিক্ষকদের স্বার্থসিদ্ধির কথাই চিন্তা করে না, তার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষক সমাজ এবং সর্বোপরি দেশের ভালো-মন্দের কথা চিন্তা করে কাজ করে।

আজকের আলোচনার বিষয় হলো, স্বামীজী ও নেতাজীর জীবনাদর্শের প্রেক্ষিতে শিক্ষকদের কর্তব্য।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হলো শিক্ষাদান। শিক্ষাদান একটি মহৎ কাজ। এই দান শুধুমাত্র শিক্ষক-শিক্ষিকারাই করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন, 'অন্ন-বস্ত্র দান অপেক্ষা জ্ঞানদান উচ্চতর। প্রাণদান অপেক্ষাও উহা মহৎ।' কারণ জ্ঞানই মানুষের প্রকৃত জীবন।'

সেই কারণে শিক্ষকতা শুধুমাত্র পেশা নয়, এটা হলো একটি ব্রত। শিক্ষকদের জীবনের লক্ষ্য অর্থ উপার্জনের থেকেও মহৎ। তবে বর্তমান সময়ে জীবন ধারণের জন্য অর্থ উপার্জনেরও প্রয়োজন আছে, সেই কারণে জীবন যুদ্ধে অর্থ অবশ্যই প্রয়োজন, তবে সেটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয় বা কাজে ফাঁকি দিয়ে অর্থ উপার্জনই শুধুমাত্র আমাদের জীবনাদর্শ হতে পারে না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই কারণেই প্রয়োজনের অতিরিক্তকেই 'বিষ' বলেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ— এই চতুর্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে অর্থ ও কামকে প্রয়োজনের মধ্যে রেখে, ধর্ম থেকে মোক্ষের পথে চলার জন্য চেষ্টা করা উচিত।

স্বামীজী প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থের নিন্দা করে বলেন, টাকাপয়সা মানুষ করতে পারে না, মানুষই চিরকাল টাকা করে থাকে। পৃথিবীতে যা কিছু উন্নতি সবই মানুষের শক্তিতে হয়েছে, উৎসাহের ও বিশ্বাসের শক্তিতে হয়েছে। ধনীর দুলাল সুভাষ বুঝতে পেরেছিলেন টাকাপয়সার পিছনে ছোটা হলো বৃথা পরিশ্রম। মানুষ না বুঝেই অর্থের পিছনে ছোটার চেষ্টা করে। এই জগতে প্রেম, ভগবত বিশ্বাস ইত্যাদি অমূল্য গুণ যার রয়েছে তিনিই তো প্রকৃত ধনী। এইরকম মহৎ লোকের কাছে বড়ো বড়ো রাজারাও গরিব। কিন্তু এই ভাব না বোঝার ফলে বর্তমান সমাজে এত নৈরাজ্য। এই পরিস্থিতি দূর করার জন্য শিক্ষকদেরই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষকদের দ্বিতীয় কর্তব্য হলো সেই শিক্ষাকেই প্রাধান্য দেওয়া যার মাধ্যমে

'ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো সম্ভব।' ছাত্র- ছাত্রীদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারলেই তা সমগ্র জনসাধারণের বিকাশে সহায়ক হবে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এইচ ভি শেষাদ্রি এই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর ঘটনার উল্লেখ করেছেন : কর্ণাটকের হিন্দু সেবা প্রতিষ্ঠানের শিশু মন্দিরে একজন পরিদর্শক একটি বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। তার আগে বাসস্ট্যান্ডে তিনি শৌচাগারে যান। যেখানে পঞ্চাশ পয়সা দেওয়ার নিয়ম। সেখানে শৌচাগার রক্ষকের দারিদ্র্য দেখে তিনি তাঁকে এক টাকা দিতে চাইলেন। কিন্তু তিনি তা নিতে অস্বীকার করে স্কুল পরিদর্শককে অবাক করে দিয়ে বললেন, 'এই সেদিন অবধি আমি বেশি পয়সা নিতাম। কিন্তু কয়েকদিন আগে আমার মেয়ে যে এই শিশু মন্দিরে পড়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,— সে ওই স্কুলে কী শিখেছে? সে বলল তার দিদিমণি অর্থাৎ শিক্ষিকা বলেছেন যে পয়সা সৎভাবে রোজগার করতে হয়। অসৎভাবে উপার্জন করা পয়সা বিষের মতো পরিত্যজ্য। সেই দিন থেকেই আমি বেশি পয়সা নেওয়া বন্ধ করেছি। যদিও আমার তাতে বেশ কষ্ট হচ্ছে।' দরিদ্র হলেও তাঁর মতো সামান্য মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত হয়। তিনি লোভ সংবরণ করতে পারেন এবং তা সম্ভব হয়েছে তাঁরই শিশু সন্তানের দ্বারা। সেই কারণেই বলা হয়,--- 'বালাদপি সুভাষিতম্ গ্রাহ্যম্।' শিশু মন্দিরের শিক্ষিকা শিশুটির জ্ঞানচক্ষু উন্মীচিত করেছেন এবং সেই শিশু তার বাবার জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ ঘটিয়েছে। এভাবেই সমগ্র জনগণের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটবে। এই বিকাশ সাধনের জন্য মুখ্য ভূমিকা ওই শিশু মন্দিরের শ্রদ্ধেয়া শিক্ষিকার মতো শিক্ষক সমাজকেই গ্রহণ করতে হবে, যা শিক্ষকদের প্রধান কর্তব্য।

দেহ, মন, বুদ্ধি ও আত্মার সার্বিক বিকাশ সাধিত হলেই পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন সম্ভব যা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রধান কর্তব্য। স্বামীজী এই জনগণকেই উদ্দেশ্য করে আবেগপূর্ণ বক্তৃতায় বলেছেন, বল— দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ

ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।' শিক্ষকের কর্তব্য হলো সকল ভারতবাসীর জীবনে পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো যেখানে থাকবে না কোনো ভেদাভেদ।

যখন শিক্ষক কোনো ছাত্রের জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ চান, তখন তার মধ্যে যা কিছু ভালো গুণ আছে, তার বিকাশ ও প্রকাশ ঘটাতে হবে। একজন শিক্ষকের কর্মদক্ষতা তখনই প্রমাণিত হবে, যখন এই বিষয়ে তিনি সফল হবেন। শিক্ষকদের সাফল্য নির্ভর করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। শিক্ষকের শিক্ষাপদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষার্থীরা কতটা জ্ঞান আহরণ করছে তার ওপরে। শেখার আগ্রহ জাগানোই একজন শিক্ষকের প্রধান কাজ।

এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানের ইচ্ছা জাগানো সম্ভব? তার উত্তরে বিদগ্ধ পণ্ডিত এইচ ভি শেষাদ্রি খুব সুন্দর ভাবে বলেছেন তিনি 'আমেরিকার ২০ জন শিক্ষক' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজন উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিকা বলেছিলেন, 'আমি কখনোই কুড়িজন ছাত্রের একটি শ্রেণীকে পড়াই না। আমি একটি শ্রেণীর কুড়ি জনকে পড়াই।' অর্থাৎ তিনি সকল ছাত্রের প্রতি সমান যত্ন নিতেন। সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি দিতেন। এটাই ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের স্পৃহা জাগানোর প্রধান রহস্য।

একটি শ্রেণীর সকল ছাত্র-ছাত্রীর নাম যদি আমরা মনে রাখতে পারি, তাহলে সেই শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে একটা আত্মিক যোগ ঘটে। অমনোযোগী ছাত্রদের নাম ধরে প্রশ্ন করলে তারা সচেতন হয়ে যায়। অনুপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীর বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর নিলে, তার পরিবারের সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। সেই ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে আরও ভালো ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মা যেমন সন্তান বাইরে থেকে ফিরে না এলে উদ্বিগ্ন হন, শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও দায়িত্ব হলো অনুপস্থিত ছাত্রদের খোঁজখবর নিয়ে

সেইমতো যত্ন নেওয়া। সেই শিক্ষকের এরকম প্রযত্নই একটি ছাত্রের পড়াশোনার উন্নতির প্রধান সোপান হতে পারে।

যেমন র‍্যাভেন্সা কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশোনার সময় সুভাষের প্রধানশিক্ষক বেণীমাধব দাস তাঁর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনি সুভাষের মধ্যে একটা নৈতিক মূল্যবোধ জাগাতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর আদর্শ শিক্ষকের উপদেশ অনুসারে সুভাষ হয়ে ওঠেন প্রকৃতি পূজারি। মনোরম সূর্যাস্তের সময় নদী তীরে বা পাহাড়ের উপর অথবা নির্জন প্রান্তরের মধ্যে সুন্দর একটা জায়গায় তিনি ধ্যান করতেন। এর ফলে তিনি মানসিক আনন্দ ও মনোবল লাভ করতেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এইচ ভি শেষাদ্রি বলেছেন, সব শিশুই শিখতে চায়, জানতে চায়, এমনকী যে বিদ্যালয়ে যায় না সেও শিখতে চায়। সর্বদাই তার বিভিন্ন জিজ্ঞাস্য থাকে। গৃহ পরিবেশই একটি শিশুর প্রথম বিদ্যালয়। বাবা-মায়ের উচিত শিশুর সকল জিজ্ঞাসার নিরসন করা। কিন্তু তাঁরা ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিয়েই কর্তব্য সম্পন্ন করেন। ফলে যদি কোনো শিশু একজন স্নেহপরায়ণ শিক্ষক বা শিক্ষিকা পায় তাহলে সে তাঁকেই আঁকড়ে থাকে। তাঁকেই সে সত্যিকারের গুরু হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে যথাযথ শিক্ষা না পেলে অসমান বা অসামাজিক বন্ধুত্বও গড়ে উঠতে পারে। ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কর্তব্যই হলো শিশুদের সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।

সুভাষের জীবনেও যখন স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব হয়, 'তখন তাঁর বয়স ১৫ বছর। তিনি বলেছেন, যখন তিনি স্বামীজীর আদর্শের সান্নিধ্যে এলেন, তখন তাঁর মধ্যে শুরু হলো এক বিপ্লব এবং সবকিছু উলটপালট হয়ে গেল। তাঁর শিক্ষার পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধি করার বহু পূর্বেই তা ঘটেছিল। তাঁর ছবি ও শিক্ষা হতে স্বামীজীকে একজন পূর্ণ বিকশিত ব্যক্তিত্ব বলে সুভাষের বোধ হচ্ছিল। প্রথমে প্রধানশিক্ষক বেণীমাধববাবুর ব্যক্তিত্বকে যথেষ্ট বড়ো বলে মনে হলেও পরে স্বামীজীর প্রদর্শিত পথের কথাই ভাবতেন।

ধীরে ধীরে সুভাষের দৃষ্টি পড়লো শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ ও পবিত্রতার দিকে। ফলে সুভাষের অন্তর্জীবনে সংগ্রাম শুরু হলো। অন্যদিকে স্বামীজীর ত্যাগ ও সেবার আদর্শ তাকে বিদ্রোহী করে তুললো পারিবারিক ও প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তাঁর মা-বাবা তাঁকে বাধা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরিণামে তিনি আরও অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। একলা চলার নীতি গ্রহণ করে তিনি সাধনা ও সংযমে ব্যাপৃত হলেন। পরে যোগসাধনা শুরু করলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারলেন আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রথমে প্রয়োজন সেবাকাজ। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন নরেন্দ্রনাথকে শিবজ্ঞানে জীবসেবার মন্ত্র শিখিয়েছিলেন, তেমনি স্বামীজীর বক্তৃতা এবং রচনাবলীও সুভাষকে শেখালো মানবসেবার আদর্শ। 'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর'— স্বামীজীর এই বাণীতে অনুপ্রাণিত সুভাষ দরিদ্র ও সাধু-সন্তদের প্রতি সদয় হয়ে উঠলেন। এরপর নিজেকে নিয়োজিত করলেন পুরোপুরি রূপে সমাজসেবায়।

সুভাষ নিজেই বলেছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী, তাহা ভাষায় কী করিয়া প্রকাশ করিব? তাঁহাদের পুণ্য প্রভাবে আমার জীবনের উন্মেষ। আজ যদি স্বামীজী জীবিত থাকিতেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন। অর্থাৎ তাঁহাকে আমি নিশ্চয়ই গুরুপদে বরণ করিতাম। যাহা হউক, যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন যে রামকৃষ্ণ -বিবেকানন্দের একান্ত অনুগত ও অনুরক্ত থাকিব— এ কথা বলাই বাহুল্য।'

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে সুভাষের যে কী সীমাহীন শ্রদ্ধা, প্রগাঢ় ভালোবাসা ও অনুরাগ ছিল তা তাঁর আবেগপূর্ণ বাক্যগুলিই স্পষ্ট করে। আজ আমাদের মতো শিক্ষকদেরও সময়ে এসেছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর পথকে অনুসরণ করে সুভাষের মতো এক একজন যোগ্য ছাত্র তৈরি করা, তা নাহলে আমাদের এই দুর্নীতির পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত পচা-গলা সমাজটাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা সম্ভব নয়। এটাই হোক শিক্ষকদের কর্তব্যবোধের প্রকৃত প্রেরণা।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সারসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী বলেছেন, শিক্ষকের প্রথম কাজ হবে 'যম' এবং 'নিয়ম'এর ১০ রকমের সিদ্ধান্তগুলিকে ছাত্রদের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট করা। 'যম' হলো, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটি। 'নিয়ম' হলো, শৌচ, সন্তোষ, তপ 'স্বাধ্যায়' ঈশ-প্রণিধান (ঈশ্বরের প্রতি স্বকর্ম সমর্পণ)। যদি কিছু ছাত্রও এই সকল ভাবনাগুলিকে উপলব্ধি করে, তাহলে তারা অত্যন্ত সুস্থ সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে, যার অনুসরণ কালক্রমে অন্যেরাও করতে পারবে।

আজ আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি শিক্ষার বহু মূল্যবান দৃষ্টান্ত বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছেন। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরা জানেই না যে, জীবনের সকল দিকের উপযোগী উৎকৃষ্ট জ্ঞানে সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব কোনো প্রাচীন ইতিহাসও আছে। আশ্চর্য হওয়ার কোনো কারণ নেই যে, আজকের শিক্ষায় সর্বাত্মক ও সুস্থ বিষয়বস্তুর অভাবে আমাদের বিদ্যার্থীরা অশ্লীল ও অসভ্য সাহিত্যপাঠে নিজেদের অভিরুচি তৈরি করে ফেলেছে। তারা গভীরভাবে মোবাইল ফোনে আসক্ত হয়ে পড়েছে। উচ্চস্তরের লেখকদের পাঠ্যপুস্তক বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। এখন সহজ সহায়িকা বই ও মানে-বই পড়ার প্রচলন হয়েছে। বর্তমানে স্কুলে পড়াশোনার বাইরেও টিউশন পড়া বিদ্যার্থীদের সাফল্য লাভের দ্বিতীয় সহজ উপায় ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে। তবে এটাও ঠিক, প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের সাহায্যে অধ্যয়ন করতে হয়। সাধারণত এটাও দেখা গেছে যে টিউশন পড়ার জন্য শিক্ষক নিজেও ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করেন এবং বিদ্যার্থীরাও প্রভাবিত হয়। এসব কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে এই প্রকার ধারণা উৎপন্ন হবে যে, নিজের পড়াশোনার কর্তব্য সততার সঙ্গে পালন করার দরকার নেই, অর্থ উপার্জনের সহজ

ও অনুচিত পদ্ধতিও গ্রহণ করা যেতে পারে। 'সংক্ষিপ্ত উপায়' অসফল হলে বিদ্যার্থীরা 'অনৈতিক পথে'র দ্বারা সাফল্য লাভ করার জন্য সচেষ্ট হয়। তাই শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের সৎপথে ও সঠিকপথে পরিচালিত হতে সহায়তা করবেন। তবেই তাঁরা তাঁদের মহান কর্তব্য পালন করতে পারবেন।

সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী বলেছেন, প্রত্যেক শিক্ষকের কর্তব্য হলো, সকল বিদ্যার্থীকে 'ধর্মতত্ত্ব' অবশ্যই পড়ানো উচিত। যাঁরা ওই উচ্চতম তত্ত্বগুলিকে নিজের আচরণে পরিস্ফুটিত করেছেন এবং দিশানির্দেশ করেছেন, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এমন মহান পূর্বপুরুষদের জীবনচরিত্র ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানো উচিত। দেশের বিশুদ্ধ এবং সত্য ইতিহাস পড়ানো উচিত। রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রুচিমার্জিত বিভিন্ন দৃষ্টান্তগুলিকে বিদ্যার্থীদের সামনে তুলে ধরা দরকার। মনঃসংযমের শাস্ত্র হিসেবে ধ্যানযোগ শেখানো উচিত। তারা যাতে নিজের জীবনের সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে এবং সব রকম সংকটের দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করতে পারে— এভাবে তাদের মানসিক দিক থেকে তৈরি করা উচিত। অধিকারবোধের থেকেও কর্তব্যবোধের ভাবনার উপর জোর দেওয়া উচিত। এককথায়, তাদের যোগ্য মানুষ হিসেবে তৈরি করা দরকার। এই সমস্তকিছু যে শিক্ষকের একার সিদ্ধান্তের দ্বারাই সম্ভব হবে তা নয়, সরকারের সদিচ্ছারও প্রয়োজন হয়। তথাপি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তরিকতার দ্বারাও এই পবিত্রকার্য সম্ভব হতে পারে।

শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানস্পৃহার সঞ্চার ঘটানো উচিত। তাদের কিছু না কিছু করতে হবে, দিতে হবে। অর্থাৎ কোনো না কোনো বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে। এরূপ তীব্র ইচ্ছা সর্বদা থাকা উচিত। তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, পত্রিকা প্রকাশ, বিতর্ক সভা, ব্যায়াম, খেলাধুলা, চিত্রকলা প্রদর্শন, সেবাকাজ ইত্যাদি ছাত্রদের দ্বারা করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উৎসাহিত করা উচিত। এই সকল বিষয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পথপ্রদর্শক রূপে কাজ করতে হবে। এইসব বিষয়ের পথপ্রদর্শক শিক্ষকদের বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া কাম্য। পড়ানোর বিষয়গুলির উপর বিশেষ জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। তাঁর চরিত্র নিষ্কলঙ্ক হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীদের সহিত স্নেহপূর্ণ তথা অভিভাবকসুলভ ব্যবহার করা উচিত। এই প্রসঙ্গে শ্রীগুরুজী বলেছেন, 'যদি শিক্ষকদের মাথায় অর্থ রোজগারের ভূত চেপে বসে, তার জন্য এধার-ওধার ঘুরে বেড়াতে হয়, এই অবস্থায় যদি তাঁকে নিজের সামাজিক সম্মান সামলাতে হয়, যদি তাঁকে শিক্ষা সম্পর্কিত বহু কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়, অনেক ছাত্রকে সামলাতে হয়— এই সব ক্ষেত্রে সেই শিক্ষকদের সুযোগ্য এবং জ্ঞানস্তর উচ্চ হওয়ার আশা করা বৃথা।

সেই কারণে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন ভীষণ জরুরি। বিশেষ করে অন্যান্য প্রদেশগুলির তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের মহার্ঘ্য ভাতার তফাতটা দেখলেই বোঝা যায়। এখানকার কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের প্রতি রাজ্য সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণ রয়েছে। প্রতি শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা ৩০ : ১ অনুপাতেই থাকা উচিত। তা না হলে ক্লাসের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। এই বিষয়গুলিতে রাজ্য সরকারেরও গুরুত্ব দেওয়া কর্তব্য। তবেই শিক্ষক-শিক্ষিকারাও তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করতে পারবেন।

জীবনের সর্বোচ্চ গুণগুলির, বিশেষ করে বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তির বিকাশ সম্ভব হবে একমাত্র দেশমাতৃকার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মধ্য দিয়ে। অতীত ও বর্তমানের মহাপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা, চিরন্তন ঐতিহ্যের প্রতি আস্থাই হলো আমাদের জাতীয় শিক্ষার অঙ্গ। এগুলোই প্রকৃত মানুষ তৈরির গুণাবলী। এর দ্বারাই দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্তরের বিকাশ সম্ভব হয়। সেজন্যই আমাদের মহাপুরুষরা নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিক গুণের উজ্জ্বল প্রতীক। যদি শিক্ষক-শিক্ষিকারা জাতীয় শিক্ষার এই ভাবাদর্শ বুঝতে ও অনুভব করতে পারেন, তাহলে তাঁরা এই ভেবে গর্বিত হতে পারেন যে, তাঁদের পেশা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরাই আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে এই মহৎ কাজের আদর্শ দূরদূরান্তে ছড়িয়ে দিতে প্রেরণা জোগাতে পারবেন। এটাই শিক্ষা জীবনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। ■

ফ ঃ ৪

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ শিক্ষাক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবোধের বৈচারিক অধিষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতীয়ত্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী একটি সংগঠন। এই সংগঠন শিক্ষা ও সমাজ হিতের সংকল্পনাকারী। শিক্ষকের পেশাগত অবস্থা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বিষয়টিকেও মহাসঙ্ঘ যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে। প্রাক্ প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষকদের জাতীয়তাবোধ ও ভারতীয় দর্শনে উদ্বোধিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৮ সাল থেকে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের যাত্রা শুরু। মহাসঙ্ঘের মূল ভাবধারা হলো— রাষ্ট্র হিতে শিক্ষা, শিক্ষা হিতে শিক্ষক, শিক্ষক হিতে সমাজ। বর্তমানে ২৮টি রাজ্যে এবং শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠন প্রসারিত। ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ শিক্ষক সংগঠন অখিল

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের জাগরণ কর্মসূচি

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের বর্তমানে ১২ লক্ষ সদস্য। ১৯৯২ সালের পর থেকে এই রাজ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে তিনটি সংগঠন যথাক্রমে বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘ, বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘ, জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘ কাজ করে চলেছে। এখন থেকে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ বিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা দুটি স্তরে সরাসরি রাজ্য ইউনিট হিসেবে কাজ করবে।

শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ আদর্শগত ভাবে সারাবছর তিনটি স্থায়ী কার্যক্রম করে তা হলো— কর্তব্যবোধ দিবস, বর্ষ প্রতিপদ ও গুরু বন্দনা। এছাড়াও সংগঠন বিস্তারের জন্য সদস্যতা অভিযান, বৈঠক, অভ্যাস বর্গ এবং

পেশাগত দাবি পূরণের জন্য ধারাবাহিক আন্দোলন। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের আন্দোলনগুলি হলো—

(১) **১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ বিকাশ ভবন অভিযান :** জাতীয় ভাবনার আলোকে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ রূপায়ণ, রাজনীতি, দুর্নীতি, তোষণ, বঞ্চনা মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্যে কলকাতার রাজপথে নামলো অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের প্রায় পাঁচ হাজার প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী সদস্য ও কার্যকর্তা। এই মহামিছিল সল্টলেক পূর্বক্ষেত্র সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সামনে থেকে শুরু এবং বিধাননগর পৌর ভবনের সামনে গিয়ে প্রশাসন বাধা দেয়। সংগঠনের ৬ সদস্যর প্রতিনিধিদল বিকাশভবনে দাবিপত্র পেশ করেন। ছিলেন বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি অনিমেষ মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক কানুপ্রিয় দাশ, বিএসএসের সাধারণ সম্পাদক বাপী প্রামাণিক এবং জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি অধ্যাপক দেবমাল্য দত্ত, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক কৃষ্ণ সরকার।

(২) **১৩ জুন, ২০২২ মহামিছিল :** জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ও কর্মচারীদের ডাকে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা প্রদান, নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্তদের শাস্তি এবং জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০২০ দ্রুত রূপায়ণের দাবিতে কলকাতার কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মহামিছিল করে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের তিন সংগঠন এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সঙ্ঘ যৌথ ভাবে।

(৩) **১ আগস্ট ২০২২, স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পালন :** অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ গোটা দেশে ১ আগস্ট বিদ্যালয়ে ভারতমাতা পূজনের মাধ্যমে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পালন করার যোজনা করেছিল। সেই যোজনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে ২০৭৪টি বিদ্যালয়ে ভারতমাতা পূজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিক্ষক স্বাধীনতা

বীরভূমে ডি আই অফিসে ডেপুটেশন প্রদান।

রাজ্য শিক্ষা পর্ষদ অফিসে স্মারকলিপি প্রদান

সংগ্রামীদের ছবি সংবলিত ক্যালেন্ডার বিতরণ করা হয়। এই জাগরণ কর্মসূচিতে ৬২০০ শিক্ষক, ১২৩৬০ শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করেন। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষায় ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয়।

(৪) **৬-১৭ জানুয়ারি, ২০২৩ শিক্ষা বাঁচাও অভিযান :** পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি, রাজনীতি ও তোষণের বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে ছাত্র, শিক্ষক ও অধ্যাপকরা যৌথ ভাবে পথে নামে গত ২০২২ সালের ডিসেম্বর ও ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে। গোটা রাজ্যে বিভিন্ন জেলা, মহকুমা ও ব্লক কেন্দ্রে ১০৮টি স্থানে পথসভার আয়োজন করা হয়। ৬ জানুয়ারি শিলিগুড়ি ও ১৭ জানুয়ারি কলকাতায় শিক্ষা বাঁচাও মহামিছিল ও সমাবেশে প্রায় পাঁচ হাজার ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপকরা অংশগ্রহণ করেন।

(৫) **১১ এপ্রিল, ২০২৩ নবান্ন অভিযান :** জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ রূপায়ণ, বকেয়া মহার্ঘ ভাতা প্রদান, স্বচ্ছ নিয়োগ ও বদলি নীতি চালু, তোষণ মুক্ত শিক্ষা নীতির দাবিতে নবান্ন অভিযানের ডাক দেয় অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের অনুমোদিত তিনটি সংগঠন। এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি অনিমেষ মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক কানুপ্রিয় দাস, বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি আশিস কুমার মণ্ডল, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপী প্রামাণিক এবং জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের রাজ্য সম্পাদিকা অধ্যাপিকা পাপিয়া মিত্র।

(৬) **১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ শিক্ষক সমাবেশ :** জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ রূপায়ণ, বকেয়া ৪০ শতাংশ মহার্ঘ প্রদান, রাজনীতি, দুর্নীতি, তোষণ মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার দাবিতে সল্টলেকের করুণাময়ী বাসস্ট্যান্ডের পাশে বিশাল শিক্ষক সমাবেশ করে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ, পশ্চিমবঙ্গ (বিদ্যালয় শিক্ষা)। এদিনের সমাবেশের পর বিকাশ ভবনে ১৩ দফা দাবিপত্র জমা করতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি আশিস কুমার মণ্ডল, রাজ্যের অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক সৈকত মণ্ডল ও অসীম দাস এবং রাজ্য কোষাধ্যক্ষ জগদানন্দ নস্কর।

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ এখন দেশের বৃহত্তম শিক্ষক সংগঠন। সদস্য ১২ লক্ষ। এখন একই নামে সারা দেশে কাজ হচ্ছে। আলাদা আলাদা নাম থাকছে না।

সোনারপুর বইমেলা

মকর সংক্রান্তি উৎসব ও সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধ

পিন্টু সান্যাল

ধনু থেকে মকর রাশি সূর্যের সংক্রমণ ঘটছে, তাই মকর সংক্রান্তি। ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা যা উৎসবের সঙ্গে বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। এরকম আরও কিছু সভ্যতা যেমন মায়া, ইনকা, মিশরীয় সভ্যতার অস্তিত্ব আজ আর নেই। আমরা সনাতন সভ্যতার এই অংশ হিসেবে গর্বিত।

হরিয়ানা, পঞ্জাবে মাঘি বা লোহরি; গুজরাটে উত্তরায়ণ, তামিলনাড়ুতে পোঙ্গল, অসমে বিহু, কেরালায় মাকারাভিলাক্কু, উত্তরপ্রদেশে খিচুড়ি, কাশ্মীরে সাঁকরাইত, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, রাজস্থানে মকর সংক্রান্তি, পশ্চিমবঙ্গে পৌষ সংক্রান্তি বা পৌষ পার্বণ— ভারতবর্ষব্যাপী একই উৎসব বিভিন্ন নামে উদ্‌যাপিত হয়। কোথাও পিঠেপুলির উৎসব, কোথাও গঙ্গায় পুণ্যস্নান, কোথাও প্রথম ফসল অগ্নিদেবতায় আহুতি, কোথাও খিচুড়ি সহভোজ, কোথাও আবার ঘুড়ি ওড়ানো। একই উৎসব, আয়োজন বিভিন্ন।

ভারতবর্ষের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এই উৎসবগুলোর মাধ্যমে এক হয়েই আমরা একটা 'জাতি' যা ইউরোপিয়ানদের উপলব্ধিতে আসে না। বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন পরিধানে সজ্জিত হয়েও আমরা বিশাল ভারতবর্ষের অংশ— একেই বিদ্বজ্জনেরা সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধ বলেছেন।

দেশ গঠনের শর্ত, একসঙ্গে বসবাস করার জন্য কী ঐক্যসূত্রের প্রয়োজন তা ইউরোপীয় দার্শনিকদের থেকে শেখার চাইতে ভারতবর্ষকে অধ্যয়ন করলে বেশি ভালো বোঝা যায়। ইউরোপ বুঝেছে ভাষা এক হওয়া প্রয়োজন, কখনো বলেছে বেশভুষা এক হতে হবে, কখনো এক উপাস্যের প্রতি আনুগত্যকে রাষ্ট্রগঠনের শর্ত বলেছে। কিন্তু ইউরোপের ধারণার ব্যতিক্রম হিসেবে বারবার পেয়েছে

ভারতবর্ষকে। ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে দেখে বিস্মিত হয়েছেন জনৈক ঐতিহাসিক। কারণ মতের বিভিন্নতাকে, বৈচিত্র্যকে মান্যতা দেওয়ার দর্শন ভারতবর্ষের বাইরে পাওয়া দুষ্কর।

কী মন্ত্রবলে এতো বড়ো দেশ এক অখণ্ড ভারতে পরিণত হলো তা গবেষণা করতে ভারতবর্ষের উৎসবগুলো নিয়ে চর্চার প্রয়োজন, উৎসবগুলোর অংশ হয়ে উপলব্ধির প্রয়োজন— এ শুধু পুঁথিগত বিদ্যা দ্বারা জানা সম্ভব নয়।

সমগ্র ইউরোপ বিভিন্ন ভাষায় ভাগ হয়ে যেদিন আলাদা আলাদা অনেকগুলো দেশ হিসেবে বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তারও হাজার হাজার বছর আগে আমাদের ত্যাগব্রতী ঋষিগণ ঐক্যের মন্ত্র এবং তা অনুশীলনের ক্ষেত্ররূপে এই উৎসবগুলোকে সমাজে প্রচলন করেছিলেন। কোনো এক কবির ভাষায় তাই বলতে হয় 'যত বিশ্ববাসী ছুটে আসবে কাছে, জানবে হেথায় কী যে মন্ত্র আছে।'

এই মন্ত্র ভারতবর্ষকে শত বিপদ, কত বহিরাক্রমণের মধ্যেও আপন সংস্কৃতিকে জাগ্রত রাখতে সাহায্য করেছে। বিভিন্ন উৎসব আকর্ষণ, ভাষার বিভিন্নতাকে, আঞ্চলিকতাকে উপেক্ষা করে ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্নতাবোধের ভ্রূকুটি থেকে হাজার হাজার বছর ধরে রক্ষা করছে।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে,

'ওঁ সচ্চিদানন্দরূপায় নমোহস্তু পরমাত্মনে।
জ্যোতির্ময়স্বরূপায় বিশ্বমাঙ্গল্যমূর্তয়ে।।'

অদ্বৈতবাদীরা উপনিষদের পরমেশ্বরকে, ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। সচ্চিদানন্দ একটি সংস্কৃত সংমিশ্রিত শব্দ যা তিনটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। সৎ অর্থাৎ সত্য, চিৎ অর্থাৎ চেতনা এবং আনন্দ অর্থাৎ ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মবোধের ফলে ঐশ্বরীয় আনন্দের অনুভূতি। আনন্দের অনুভূতির মাধ্যমে এই একাত্মতার উপলব্ধির অনুশীলনই 'উৎসব'। উৎসবের মাধ্যমে সমাজ ও ব্যক্তির দ্বৈতসত্ত্বার যেন বিলোপ ঘটে, ব্যক্তি যেন সমাজের সঙ্গে মিশে যায়।

যোড়শ সংস্কার হলো হিন্দুদের জীবনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ষোলটি বহিরঙ্গ সংস্কার যা গর্ভাধান থেকে শুরু হয়ে পরিণতি পায় অন্তিম সংস্কারে। বিভিন্ন প্রথা ব্যক্তিকে সমাজের সঙ্গে যোগ দেওয়ার সুযোগ এনে দেয়। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে এই যোগের চেষ্টা ব্যক্তির দিক থেকে থাকে আর উৎসব হচ্ছে সমাজে সেই একমাত্র সংস্কার যেখানে সমষ্টির আহ্বান থাকে ব্যষ্টির প্রতি।

উৎসবের মাধ্যমে ব্যষ্টিকে সমষ্টির দিকে টেনে ভারতীয় সমাজ আপন শক্তির জাগরণ করে। ভারতবর্ষে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা একইসঙ্গে চলেছে। আপন উপাসনা পদ্ধতি জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা ভারতবর্ষে ছিল না, কারণ এই দেশ 'যত মত তত পথ'-এর আদর্শে বিশ্বাসী। কিন্তু যখন মূর্তিপূজার শাস্তি হিসেবে উপাসনা পদ্ধতির নামে অত্যাচার, নৃশংসতার শিকার হয়েছে ভারতীয় সমাজ সেই সময় মানসিক আঘাত থেকে বের হয়ে সমাজ স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়েছে, নিজেদের মধ্যে ঐক্য ফিরে পেয়েছে উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে।

পৃথিবীর এমন কোনো সভ্যতা নেই, সমাজ নেই যেখানে সভ্যতার প্রবহমানতার পথে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর জন্য কিছু কুপ্রথা সভ্যতার গতিকে বাধা না দিয়েছে— ভারতবর্ষ তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু সামাজিক উৎসব ভারতবর্ষে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি বিকৃতিকে নিশ্চিহ্ন করতে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। ভারতীয় সমাজ যখন সমুদ্রপারের, হিমালয়ের ওপারের লুটেরাদের থেকে নিজেদের বাঁচাতে প্রকাশ্যে মূর্তিপূজা থেকে বিরত থেকেছে তখন উৎসব তাদের সংস্কার, উপাসনা, আধ্যাত্মিকতাকে অনুশীলন ও অনুভবের সুযোগ এনে দিয়েছে। মূর্তি পূজাকে বাধা দেওয়া যায় কিন্তু মহাজাগতিক ঘটনাবলীকে উদ্‌যাপনের মাধ্যমে ঈশ্বরোপাসনাকে কীভাবে বাধা দেবে? সেকথা তো তাদের কেতাবে উল্লেখই নেই।

সূর্যের উত্তরায়ণ অর্থাৎ উত্তরদিকে যাত্রাকেই মকর সংক্রান্তি উৎসব হিসেবে পালিত হয়। পৃথিবীর চারিদিকে সূর্যের আপাত গতিকে ১২টি রাশির মাধ্যমে ভাগ করা হয়— মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। প্রত্যেক রাশিতে সূর্য একমাস করে অবস্থান করে এবং ১ বছরে একটি পূর্ণচক্র সম্পাদিত হয়। শাস্ত্রে সূর্যের ১২টি নাম আমরা পাই— সূর্য নমস্কারের ক্ষেত্রে ১২টি অবস্থানে ১২টি নামে সূর্যকে প্রণাম করা হয়--- মিত্র, রবি, সূর্য, ভানু, খগ, পুষ্ণ, হিরণ্যগর্ভ, মরীচ, আদিত্য, সবিত্র, অর্ক ও ভাস্কর।

মকর সংক্রান্তি সূর্যের ধনু রাশি থেকে মকর রাশিতে প্রবেশের সময়। পৃথিবীর তিনধরনের গতির ফলে আকাশে সূর্যের অবস্থানের পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করে থাকি। পৃথিবীর নিজের অক্ষের চারিদিকে গতি অর্থাৎ আহ্নিক গতির জন্য সূর্যকে পূর্বদিকে উদয় ও পশ্চিমদিকে অস্ত যেতে দেখি অর্থাৎ দিন ও রাত্রি হয়। পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্য দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্তন হয় এবং সূর্যকে আকাশের বিভিন্ন নক্ষত্রসজ্জার সাপেক্ষে বিভিন্ন অবস্থানে দেখতে পাই। আকাশে সূর্যের এই অবস্থানকে চিহ্নিত করতেই পৃথিবীর চারিদিকে ১২টি রাশি দিয়ে ৩৬০°-কে ভাগ করা হয়েছে।

পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষ কক্ষপথের তলের লম্বদিকের সাপেক্ষে ২৩.৫° কোণে হেলে থাকে। ফলে, আমরা সূর্যকে প্রতিদিন একজায়গা থেকে উদয় হতে দেখি না, উত্তর-দক্ষিণ বরাবর সরতে দেখি। উত্তর গোলার্ধ তথা ভারতবর্ষ থেকে দেখলে যেদিন সূর্য নিজের দক্ষিণতম অবস্থান থেকে উত্তরদিকে যাত্রা শুরু করে সেই দিনটিকেই উত্তরায়ণ বলে। উত্তরায়ণের দিন ক্ষুদ্রতম দিন আর দীর্ঘতম রাত্রি হয় আর এরপর থেকে দিনের সময় বাড়তে থাকে ও রাত্রির সময় কমতে থাকে। একইভাবে, সূর্য উত্তরদিকে সরতে সরতে যখন উত্তরতম প্রান্তে পৌঁছে যায় এবং দক্ষিণ দিকে তার যাত্রা শুরু হবার পালা সেইদিনটিকে দক্ষিণায়ন বলা হয়। ভারতবর্ষে সেই দিনটি হয় ২১ জুন, সেই দিনে দীর্ঘতম দিন ও ক্ষুদ্রতম রাত্রি হয়।

সূর্যের উত্তরায়ণ (দক্ষিণতম অবস্থান) থেকে দক্ষিণায়ন (উত্তরতম অবস্থান) যাত্রার মাঝে এমন একটি দিন আসে যখন দিন ও রাত্রি সমান হয়; সেই দিনটিকে বলে মহাবিষুব বা বসন্ত বিষুব (২০ মার্চ)। একইভাবে, দক্ষিণায়ণ থেকে উত্তরায়নে এ সূর্যের যাত্রার মাঝে ২৩ সেপ্টেম্বর দিন ও রাত্রি সমান হয় যাকে জলবিষুব বা শারদীয় বিষুব বলা হয়। এইভাবে একটি বছরকে চারটি বিশেষ দিন বা বিন্দু দিয়ে ভাগ করা হয়েছে এবং বিশেষ দিনগুলিকে চিহ্নিত করতে বিভিন্ন উৎসবের প্রচলন হয়েছে।

ভারতীয় সভ্যতা এই ধরনের মহাজাগতিক ঘটনাবলীকে উৎসবের মাধ্যমে পালন করে আসছে প্রাগৈতিহাসিককাল

থেকে। উত্তরায়ণ থেকে সূর্যের তেজ বাড়তে থাকে, দিনের দৈর্ঘ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কর্মচঞ্চলতা বাড়ে, দিনের আলোয় কাজের সময় বেশি পাওয়া যায়। মানুষ শীতের জড়তা কাটিয়ে নিজের শ্রমক্ষমতা ফিরে পায়, গাছ আবার পল্লবিত ও কুসুমিত হওয়ার পথে এগিয়ে যায়; শীতকালে যে সমস্ত শারীরিক সমস্যার মুখোমুখি আমরা হই সেগুলোও কমতে থাকে, মাঠে একটু বেশি খেলা সময় পায় শিশু-কিশোরের দল।

পৃথিবীর প্রাণশক্তির উৎস সূর্য— আর এ যেন সূর্যেরই পুনর্জন্ম। তাই উত্তরায়ণ বা মকর সংক্রান্তি সূর্যোপাসনার এক উত্তম সময়।

গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ২৪তম শ্লোকে বলা হয়েছে,

'অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।

তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।।'

অর্থাৎ যে মার্গে জ্যোতির্ময় অগ্নির অধিপতি দেবতা, শুক্লপক্ষের অধিপতি দেবতা এবং উত্তরায়ণের ছয়মাসের অধিপতি দেবতা থাকেন, সেই মার্গে মৃত্যু হলে ব্রহ্মবিদ যোগীগণ উপরিউক্ত দেবাদিগণের দ্বারা ক্রমশ নীত হয়ে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

উত্তরায়ণে সূর্যের এই সংক্রান্তিতে বিভিন্ন নদীতে পুণ্যস্নান, শাস্ত্রীয় কর্মকাণ্ড আমরা ভারতবর্ষব্যাপী দেখতে পাই।

মকর সংক্রান্তি উৎসব থাইল্যান্ডে সোংক্রান, কম্বোডিয়ায় মহা সোংক্রান, মায়ানমারে থিংইয়ান, লাওসে পি মাই লাও নামে পালিত হয় যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তৃতিকে তুলে ধরে।

ঋকবেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। ঋকবেদের প্রথম মণ্ডলের ৩৫তম সূক্তের পঞ্চম ঋক্‌টি হলো—

'বি জনাঞ্ছ্যাবাঃ শিতিপাদো অখ্যন্ রথং হিরণ্য প্রউগং বহন্ত।

শশ্বদ্বিশঃ সবিতুর্দৈব্যস্যোপস্থে বিশ্বা ভুবনানি তস্থুঃ।।'

অর্থাৎ সূর্যরশ্মিজনিত হিরণ্যসদৃশ উত্তরদিকের অক্ষ ও শিশিরের নিম্নাক্ষ এই দুই অক্ষের মাঝেই পৃথিবীর সবকিছুই অবস্থানরত।

ঋকবেদের সময় থেকেই সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিনায়ণ গতির ধারণা ভারতবর্ষের ছিল।

ঋকবেদের প্রথম মণ্ডলের ২২তম সূক্তের ১৮তম ঋকে বলা হচ্ছে,

'ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ অতো ধর্মাণি ধারয়ন্।।'

এবং (১।২২।২০) ঋকে বলা হয়েছে,

'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ'।

দিবীব চক্ষুরাততম্।।'

এই দুটি ঋকে বিষ্ণুর বা সূর্যের তিনটি পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। এই তিন পদক্ষেপ একটি উত্তরায়ণ বিন্দুতে, একটি বসন্ত বিষুবে (জলবিষুব) এবং একটি দক্ষিণায়ণ বিন্দুতে। শেষেরটি পরম পদ বলে বিবেচিত। কারণ এখান থেকেই সূর্যের দক্ষিণায়ণ যাত্রা শুরু এবং বর্ষাকালেরও শুরু।

এইভাবে ঋকবেদ, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণে সূর্যের গতি, বিশেষ অবস্থান ও তার ফলে ঋতু পরিবর্তনের উল্লেখ পাওয়া যায়। কখনো বসন্ত, কখনো বর্ষাকে বছরের শুরু হিসেবে ধরে কালপঞ্জী নির্মিত হয়েছে আর সূর্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানকে উদ্‌যাপন করা হয়েছে উৎসবের মাধ্যমে। এই উৎসবগুলি ভারতবর্ষে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার প্রাচীনত্ব ও গুরুত্বকে তুলে ধরে। বিভিন্ন রূপকের মাধ্যমে মহাজাগতিক ঘটনাবলীকে ঋকবেদ, বিভিন্ন ব্রাহ্মণদের তুলে ধরা হয়েছে।

ভারতবর্ষে নাকি ইতিহাস চর্চা ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষ নিজের ইতিহাসকে পাথরে লিখেছে বিভিন্ন মূর্তির কারুকার্যে, রামায়ণ-মহাভারত, ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ইতিহাসের ঘটনাবলীকে মহাজাগতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে মিলিয়ে দিনক্ষণ পর্যন্ত এমনভাবে উল্লেখ করেছে যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে তার বিশ্বাসযোগ্যতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। লৌকিক বিশ্বাস, ভক্তির ফলে কিছু অতিরঞ্জন হয়েছে কিন্তু অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সফট্‌ওয়ার সিমুলেশন-সহ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে আসল ইতিহাস বের হয়ে আসছে। ভারতীয় পুঁথির ঐতিহাসিকতা, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নিয়ে ইউরোপ আজ নীরব। কিন্তু বিজ্ঞান, আজ ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিকে নতুনভাবে চিনিয়ে দিচ্ছে।

ভারতবর্ষের ঋষিগণ এই কারণেই হয়তো যে কোনো ঘটনা উল্লেখের সময় বিভিন্ন নক্ষত্র ও গ্রহের অবস্থান উল্লেখ করেছেন এমনভাবে যেন তা কালের গর্ভে হারিয়ে না যায়। হারিয়ে যায়ওনি। ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল পরাধীনতার ফলে আপন ভাষা থেকে দূরে সরেছে, নিজেদের ঐক্যভাব ভুলেছে, আপন ইতিহাস ভুলেছে কিন্তু উৎসবের মাধ্যমে আনন্দ করতে ভোলেনি। ফলে পরোক্ষে ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভাষা, জাতীয়তার ঐক্যসূত্র বেঁচে থেকেছে। মহাকাল জানেন যেদিন ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক স্মৃতিসৌধগুলি একে একে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেদিন ভারতীয়দের মধ্যে বেঁচে থাকবে তাদের উৎসব আর নতুন প্রজন্ম যখন তার কারণ বিশ্লেষণ করতে বসবে, একে একে বেরিয়ে আসবে তাঁর আপন ভাষা, ইতিহাস, সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা। এই ভাবেই এক সনাতন সংস্কৃতি নিজেকে কালজয়ী করার রসদ উৎসবের মাধ্যমে নিজের মধ্যে জিইয়ে রেখেছে।

মকর সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নের সঙ্গে পিতামহ ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু, গুরুগোবিন্দ সিংহের চল্লিশজন শিষ্যের বলিদান-সহ ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলী জড়িয়ে আছে। সেই ইতিহাসকে স্মরণ করে সমাজের স্ফূর্তি, আশা ও উদ্যমের মাধ্যমে আত্মশক্তি জাগরণের উৎসব মকর সংক্রান্তি।

যুদ্ধে পরাজিত হলেও রাষ্ট্রের পুনর্জাগরণের সম্ভাবনা ততক্ষণ জীবিত থাকে যতক্ষণ সেই রাষ্ট্র আপন সংস্কৃতির বন্ধনে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। রাষ্ট্র শুধুমাত্র একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী বা ভূমি নয়; রাষ্ট্রের ভিত্তি রচিত হয় সেই সংস্কৃতির মাধ্যমে যা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বন্ধন দৃঢ় করে সমষ্টিতে পরিণত করে এমন এক সমাজ তৈরি করে যারা তাদের সংস্কৃতির মূর্ত রূপ আপন রাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়।

সংস্কৃতির প্রতি গর্ব থেকেই মাতৃভূমির প্রতি গর্ব এবং সেই গর্বকে, সেই সাংস্কৃতিক পরিচয়কে বাঁচিয়ে রাখার চেতনার মধ্য থেকেই স্ফুরিত হয় রাষ্ট্রীয় অস্মিতা এবং তাতে স্বাধীনতার অঙ্কুর প্রাণবায়ু লাভ করে। সাংস্কৃতিক চৈতন্য ব্যতীত রাষ্ট্রীয়তার বীজ কখনোই বৃক্ষে পরিণত হতে পারে না বা রাষ্ট্রীয়তা সেই দিন লুপ্ত হয়ে যায় যেদিন ছলনার দ্বারা ভ্রমিত হয়ে বা আপন সংস্কৃতির প্রতি অজ্ঞানতার থেকে জন্ম নেওয়া অনুকরণ প্রবণতা সাংস্কৃতিক চৈতন্যকে নষ্ট করে।

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক অখণ্ডতা ও গৌরবময় ইতিহাসের উপলব্ধির মধ্যেই নিহিত আছে মকরসংক্রান্তি উৎসব পালনের সার্থকতা। ◻

‘হিন্দ কা চাদর’ গুরু তেগবাহাদুর

কানু রঞ্জন দেবনাথ

গুরু তেগবাহাদুর আনন্দপুর সাহিব নির্মাণ করে সেখানেই বাস করতেন। শৈশবে তাঁর নাম ছিল তেগ মল। মাত্র ১৪ বছর বয়সেই বাবার সঙ্গে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহস বা বাহাদুরি দেখিয়েছিলেন। তাঁর এই বাহাদুরিতে মুগ্ধ হয়ে সেই সময় তাঁর পিতা তাঁর নাম তেগমল বদলে তেগবাহাদুর রেখেছিলেন। ধৈর্য ও ত্যাগের প্রতিমূর্তি তেগবাহাদুর ‘বাবা বাকালা’ নামে এক জায়গায় ২০ বছর ধরে ধ্যান, সাধন বা একাকিত্ব পালন করেছিলেন। অষ্টম গুরু হরকিষেণ গুরুতর অসুস্থ হলে মৃত্যুর পূর্বে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে তেগবাহাদুরের নাম ঘোষণা করেন।

নিজেদের ধর্ম রক্ষার জন্য কাশ্মীরের প্রায় পাঁচশো হিন্দু পণ্ডিত তেগবাহাদুরের শরণাপন্ন হন। তেগবাহাদুর পণ্ডিতদের এই ধর্মসংকট নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে চিন্তা করতে থাকলে তখন তাঁর পুত্র গোবিন্দ দাস (পরবর্তীকালের গুরু গোবিন্দ সিংহ) পিতা তেগবাহাদুরকে তাঁর জীবনের বিনিময়ে হিন্দু পণ্ডিতদের রক্ষা করার পরামর্শ দেন।

পুত্রের পরামর্শ শুনে তেগবাহাদুর তখন হিন্দু পণ্ডিতদের বলেন, ‘আপনারা বাদশা ঔরঙ্গজেবের কাছে খবর পাঠান যে গুরু তেগবাহাদুরকে যদি ঔরঙ্গজেব ইসলাম কবুল করাতে পারে, তাহলে আপনারাও ইসলাম কবুল করবেন’।

ঔরঙ্গজেব তেগবাহাদুরের সঙ্গে আসা তাঁর তিনজন সঙ্গী বা শিষ্যের মধ্যে একজন ভাই মোতিদাসকে দুটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে করাত দিয়ে দু’ টুকরো করে ফেলেন। অপর শিষ্য ভাই দয়াল দাসকে ফুটন্ত জলে ডুবিয়ে মারা হয়। আরেক শিষ্য ভাই সতী দাসকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। তবুও তেগবাহাদুর নিজের ধর্ম ত্যাগ করতে রাজি হননি।

পাঁচদিন তাঁর উপর নির্মম অত্যাচার চালানোর পরেও যখন ঔরঙ্গজেব তেগবাহাদুরকে ইসলাম কবুল করাতে ব্যর্থ হন তখন লালকেল্লার কাছের বাজার চত্বরে চাঁদনী চকে শিকলে বেঁধে প্রকাশ্যে দিবালোকে তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়। শিরশ্ছেদ কার সময় তেগ বাহাদুর মাথা উঁচু করে স্থিরচিত্তে বীরের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন।

প্রতিটি শিখ ধর্মাবলম্বী তাঁর বলিদানের দিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে বলেন,—‘গুরু শীশ দিয়া পর সির ন দিয়া’, যতদিন ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় ধর্ম টিকে থাকবে, ততদিন গুরু তেগবাহাদুরের নামও প্রতিটি দেশপ্রেমী এবং ভারতীয় সংস্কৃতি প্রেমীর কাছে অমর হয়ে থাকবে।

ধর্মপ্রচারের জন্য গুরু তেগবাহাদুর নানান স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি সমাজে অন্ধবিশ্বাস, রক্ষণশীলতা ও কুসংস্কারের বিরোধিতা করে এক নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য তিনি ধর্মশালা, কূপখনন করেছেন।

তাঁর তীর্থপর্যটনের সময়ে ১৬৬৬ সালে পাটনায় তাঁর পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই পুত্রই পরবর্তীকালে শিখদের দশম গুরু ‘গুরুগোবিন্দ সিংহ’ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। গুরু তেগবাহাদুর হলেন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং সরল জীবনযাত্রার মূর্ত প্রতীক। সত্য ও চিরন্তন মূল্যবোধ রক্ষার জন্য তাঁর আত্মত্যাগ একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। সত্যের জন্য, আস্থার জন্য এবং সর্বোপরি মানবতার জন্য তাঁর আত্মত্যাগ বা বলিদান ভারতবাসী চিরদিন মনে রাখবে। তাঁর আত্মত্যাগ বা বলিদান কেবলমাত্র তাঁর ধর্মবিশ্বাসকে অনুসরণ করার জন্যই নয়, বরং সকলের মানবিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রক্ষায় সুনিশ্চিত করার জন্যও ছিল। তাঁর বলিদান বিশ্বের মানবাধিকারীদের জন্য ‘প্রথম বলিদান’ বলে মনে করা হয়ে থাকে।

যেখানে তিনি প্রাণবলিদান দিয়েছিলেন সেই শীশগঞ্জ গুরুদ্বারা তাঁরই স্মৃতিতে নির্মিত হয়েছে। তেগবাহাদুর বিশ্বের ইতিহাসের সেইসব মহান ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম যারা বিশ্বাস, মানবিক মূল্যবোধ ও নীতি আদর্শ রক্ষার জন্যই জীবন বলিদান দিয়েছেন। তিনি আমাদের দেখিয়ে গেছেন যে নিজের ধর্ম অন্য যে কোনো উপাসনা পদ্ধতির চেয়ে বড়ো। তাঁর মতে, মানবতার চেয়ে বড়ো ধর্ম পৃথিবীতে আর নেই। আর ভারতীয় ধর্মই হলো মানবতার ধর্ম। তাঁর বলিদানের কথা স্মরণীয় করে রাখার জন্যই তাঁর বলিদান স্থলে একটি গুরুদ্বারা সাহিব। তৈরি করা হয়েছে,— যাকে ‘গুরুদ্বারা শীশগঞ্জ’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। তিনি গুরুনানকের সিদ্ধান্ত প্রচারের জন্য কাশ্মীর ও অসমের মতো দূরবর্তী স্থানেও ভ্রমণ করেছিলেন। ১৬৭৫ সালের ২৪ নভেম্বর, চাঁদনী চৌক, দিল্লিতে গুরু তেগবাহাদুরের প্রকাশ্যে দিবালোকে শিরশ্ছেদ করা হয়।

ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে

নারী শিক্ষা বিস্তারে নারীর ভূমিকা ও বর্তমান প্রেক্ষাপটে তার কর্তব্য

নিবেদিতা গুপ্ত সাহা

একথা সত্যি যে, একজন পুরুষকে যখন শিক্ষাদান করা হয় তখন একজন ব্যক্তি শিক্ষিত হয় আর একজন নারীকে শিক্ষাদান করা হলে গোটা পরিবারটিকে শিক্ষিত করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন কোনো জাতির প্রগতির শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি নারীদের প্রতি তার মনোভাব। অর্থাৎ রাষ্ট্রের হিতে নারী শিক্ষার বিস্তার অপরিহার্য।

ভারতবর্ষের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যায় যে নারী শিক্ষা নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে। বৈদিক যুগে নারীরা শিক্ষা অর্জন করতে পারতেন। যাগযজ্ঞে অংশগ্রহণ করতে পারতেন। এমনকী তারা বৈদিক জ্ঞান অর্জন করারও অধিকারিণী ছিলেন। বিদুষী নারীদের বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হতো। যেমন 'ঋষিকা' অর্থাৎ যিনি ঋষিদের মতোই মন্ত্রদ্রষ্টা হওয়ার অধিকারিণী, 'ঋত্বিকা' যিনি যজ্ঞের অধিকারিণী, 'ব্রহ্মবাদিনী' অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করছেন, 'মন্ত্রদৃক' যিনি মন্ত্র বা বৈদিক জ্ঞান অর্জন করেছেন ইত্যাদি। রামায়ণ ও মহাভারতে কুন্তী, কৌশল্যা, তারা, দ্রৌপদী প্রভৃতি নামের সঙ্গে 'ঋত্বিকা' ও 'মন্ত্রদৃক' শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। রাজা জনকের রাজসভায় গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে তর্কবিদ্যার প্রতিদ্বন্দ্বিতার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সেখানে এটিও দেখা যায় যে ব্রহ্মবাদিনী গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকেও তর্কে পরাজিত করেছেন। উপনিষদে বেশ কিছু বিদুষীর নাম পাওয়া যায়। যেমন সুলভা, প্রথিতেয়ী প্রভৃতি। নারীরা তর্কসভায় বিচারকের আসনও গ্রহণ করতেন, যেমন শঙ্করাচার্যের সঙ্গে মণ্ডন মিশ্রের তর্কসভার বিচারক ছিলেন মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী উভয় ভারতী। মহাভারতে অর্জুনের নির্বাসনকালে চিত্রাঙ্গদার নাম আমরা পাই একজন দক্ষযোদ্ধা হিসেবে। সুভদ্রা ছিলেন একজন দক্ষ সারথি।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তন ঘটতে থাকলো এবং তার প্রভাব দেখা যেতে লাগল নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও। মধ্যযুগে ইসলামি আগ্রাসনের পর নারী শিক্ষা হ্রাস পেতে লাগলো এবং নারী শিক্ষার অবনতি হতে লাগলো। সামাজিক শৃঙ্খলা ও বিধি নিষেধ কঠোরভাবে প্রয়োগ হতে শুরু করল এবং সমাজ

কাদম্বিনী গাঙ্গুলি

সরলা দেবী

লেডি অবলা বসু

ক্রমশ আচারসর্বস্বতার দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করলো। নারী শিক্ষার এই অবক্ষয়ের যুগে যে ক'জন নারী নারীশিক্ষার দিশারি হয়ে পথ দেখিয়েছিলেন তাদের মধ্যে সাবিত্রীবাঈ ফুলে, সরলা দেবী চৌধুরানী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, লেডি অবলা বসু, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ।

নারী শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী নারীগণ

সাবিত্রীবাঈ ফুলে : সাবিত্রীবাঈ ফুলে ছিলেন ভারতের প্রথম মহিলা শিক্ষক। তিনি তার স্বামী জ্যোতিরাও ফুলের সঙ্গে বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য কাজ করেছিলেন। তাঁরা বাল্যবিবাহ ও সতী প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি শোধক সমাজ নামে একটি সামাজিক সংস্কার সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি পুনেতে নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

সরলা দেবী চৌধুরানী : সরলা দেবী চৌধুরানী ১৯১০ সালে অধুনা প্রয়াগরাজ ভারতের প্রথম মহিলা সংগঠন ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় নারীদের উন্নয়নের স্বার্থে স্ত্রীশিক্ষা-সহ অন্যান্য বিবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করে এই সংগঠন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শাখা বিস্তার করে। তিনি ভারতের জাতীয় সংগীত জনগণমনর কয়েকটি পদে সুরারোপও করেছিলেন।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী : বঙ্গ তথা ভারতের নারী জাগরণের ক্ষেত্রে ঠাকুরবাড়ির অবদান অনস্বীকার্য। প্রাচ্যের সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্যের গ্রহণযোগ্য উদার ভাবনার সার্থক সমন্বয়ে নারী জাগরণের যে আদর্শ স্থাপিত হয়েছিল তার অন্যতম অগ্রবাহিকা ছিলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। তাঁর প্রথম পরিচয় তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত অনুবাদক। তিনি সেকেলে রক্ষণশীলতা বা উগ্র আধুনিকতার বিরোধী ছিলেন ছিলেন। তাঁর নারী স্বাধীনতার মূল মন্ত্র ছিল 'সেকালের ধীরা স্থিরাদের সঙ্গে একালের বীরা হতে হবে অথবা সেকালের শ্রী ও হ্রীর

ফ ঃ ৫

সঙ্গে একালের ধী মেলাতে হবে’।

কাদম্বিনী গাঙ্গোপাধ্যায় : ১৮৮২ সালে ভারতে যে দুজন মহিলা প্রথম স্নাতক হওয়ার সম্মান অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন কাদম্বিনী গাঙ্গোপাধ্যায়। স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে তার অবদান অনেক। তার নেতৃত্বে ভাগলপুরে নারী মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়। আর এদের চেষ্টাতেই ভারতের প্রথম মহিলা সমিতি গঠিত হয়। নারী শিক্ষা প্রসারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। সমাজে প্রচলিত কুপ্রথা থেকে মেয়েদের মুক্ত করা তথা বিধবা বিবাহের সহযোগিতার কাজে তিনি নিরলসভাবে চেষ্টা করে গেছেন।

লেডি অবলা বসু : উনবিংশ শতাব্দীতে যে অভূতপূর্ব নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল তা নারীরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন লেডি অবলা বসু ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। নারী সমাজের উন্নয়ন লেডি অবলা বসুর জীবনব্রত ছিল। স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ও বিধবাদের অর্থকরী শিক্ষাদানের জন্য তিনি ১৯১৯ সালে নারী শিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

ভগিনী নিবেদিতা : ভগিনী নিবেদিতা আয়ারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় ভারতবর্ষে আসেন। এরপর তিনি কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এর সঙ্গে তিনি নানা মানব কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। সকল বর্ণের ভারতীয় নারীর জীবনযাত্রার মানের উন্নতির লক্ষ্যে তিনি কাজ শুরু করেন। তাঁর এই কাজের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ‘লোকমাতা’ আখ্যা দেন।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারীর কর্তব্য : ভারতবর্ষে যতবারই নারী শক্তিকে খর্ব করার চেষ্টা করা হয়েছে, ঠিক ততবারই নারী তার আপন মহিমায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নিজের মর্যাদা সসম্ভ্রমে অর্জন করেছে। আজকের এই যুগে দাঁড়িয়ে তাই নারী শক্তির প্রাচীন গৌরবগাথা পাঠ করলেই নারীর কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। স্বামীজী বলছেন, ‘এমন একটিও সমস্যা নাই, ‘শিক্ষা’ —এই মন্ত্র বলে যাহার সমাধান না হইতে পারে। প্রকৃত শিক্ষার ধারণা কিন্তু এখনও আমাদের মধ্যে উদিত হয় নাই। ...শিক্ষা বলিতে ব্যক্তিকে এমন ভাবে গঠিত করা, যাহাতে তাহার ইচ্ছা সদ্‌বিষয়ে ধাবিত হয় এবং সফল হয়। এই ভাবে শিক্ষিত হইলে ভারতের কল্যাণ সাধনে সমর্থা নির্ভীক মহীয়সী নারীর অভ্যুদয় হইবে। তাঁহারা সঙ্ঘামিত্রা, লীলা, অহল্যাবাঈ ও মীরাবাঈয়ের পদাঙ্ক অনুসরণে

সাবিত্রীবাঈ ফুলে

ভগিনী নিবেদিতা

সমর্থ হইবেন, তাঁহারা পবিত্র স্বার্থশূন্য বীর হইবেন।’

নারীকে সর্বাগ্রে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। ভারতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত, ভারতীয় সংস্কারের দ্বারা পোষিত, ভারতীয় আদর্শ, ন্যায় ও মূল্যবোধ শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় নারীকেই ভারতবর্ষের সংস্কার ও সমৃদ্ধি রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। একথা স্মরণমাত্রেই নিমেষে রক্তে এক অভূতপূর্ব হিল্লোল বয়ে যায়, হৃদয়তন্ত্রীতে এক তড়িৎ স্পন্দন অনুভূত হয় যে আমরা আমাদের আরাধ্যা দেবী সীতা, সাবিত্রী, মদালসা ও মা সারদার বংশধর। যে পবিত্র ধূলিকণায় তাঁরা লীলা করে গেছেন, আমরা সেই পুণ্যক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করবার সুযোগ পেয়েছি।

ভারতবর্ষের এই শাশ্বত সংস্কারের দীপশিখাকে অনির্বাণ রাখার গুরুদায়িত্ব আমাদের নারীদের কাঁধে। তবে মনে রাখা দরকার, কোনো দেশের সংস্কার তার সমৃদ্ধির দ্বারাই রক্ষিত হয়। যে দেশের সমৃদ্ধি নেই সে দেশের সংস্কারও ক্ষয়িষ্ণু। বর্তমানে দিকে দিকে সমৃদ্ধ ভারতের জয়ডঙ্কা বেজে উঠেছে। এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য ভারতীয় সংস্কারকে সর্বস্তরে রক্ষা করা। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ আমাদের মজ্জাগত হয়ে উঠেছে। আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আমরা সকলে সাবিত্রীবাঈ ফুলে না হতে পারি, ভগিনী নিবেদিতা না হতে পারি কিন্তু নিজ নিজ পরিবারে ভারতীয় সংস্কার ও সংস্কৃতির দীপশিখাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখতেই পারি। এতে একাধারে নিজেরও মঙ্গল, দেশেরও মঙ্গল।

আরেকটি কথা, ভোগসর্বস্বতা এখন জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে। এই ভোগসর্বস্বতার অমোঘ আকর্ষণে নারী আজ বিবেকরহিত। কিন্তু এর হাত থেকে পরিত্রাণ দরকার। আমাদের ত্যাগের মাধ্যমে উপভোগ করা দরকার। স্বামীজী বলছেন, ‘হে ভারত ভুলিও না তুমি জন্ম হইতে মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত।’ আমাদের সেই ত্যাগমন্ত্রে উজ্জীবিত হতে হবে। পাশ্চাত্যের নারী স্ত্রী। নারীদের ধারণা সেখানে স্ত্রীত্বেই কেন্দ্রীভূত। কিন্তু ভারতে নারী মাতৃস্বরূপা। মাতৃত্বেই তার আরম্ভ এবং মাতৃত্বেই তার শেষ। এই মাতৃশক্তি যুগে যুগে ভারতে পূজিতা ও বন্দিতা হয়ে রয়েছেন। আমরা সকলে তো তারই মূর্তিময়ী স্বরূপ, এটি ভুললে চলবে না। কিছু পশ্চিমি ধারণা ভারতীয় মহিলাদের বিপথগামী করে তুলছে, যা জাতির ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে বড়োই বিপজ্জনক।

যেমন আজকাল মাঝে মধ্যেই শোনা যায় ‘নারী সশক্তিকরণ’ বা ‘Women Empowerment’। ঘটা করে আমরা ‘Women's Day’ পালন করি। কিন্তু এ বড়োই পশ্চিমি ধারণা দোষে দুষ্ট। ভারতে নারী চিরকাল প্রণম্যা, শক্তির উৎসস্বরূপা, আপনার বলে চিরবলীয়ান। তাকে শক্তি দেবার কথা বলা ভারতীয় জীবনদৃষ্টির কাছে অত্যন্ত হীন একটি ধারণা। আর এ সকল ধারণার বশবর্তী হয়ে ভারতীয় নারী তথাকথিত শিক্ষিত হয়েও স্বরোজগেরে হয়েও, তার উচ্চ আদর্শ থেকে কোথাও যেন বিচ্যুত হয়ে পড়ছে। নারীর স্বাধীনতা আজ তাই স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসতি। ভারতীয় নারীর সামনে আধুনিকতার নামে ভারতীয় জীবনাদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী চটুল কিছু ধারণাকে জনপ্রিয় করে সমাজকে টুকরো টুকরো করে ফেলার এ এক সর্বনাশা গভীর চক্রান্ত। এ সম্পর্কে আমাদের নারীদের সকলকে সজাগ থাকতে হবে। বিবেক ও বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করে আমাদের কর্তব্য নিরূপণ করতে হবে। আলোর পথের দিশারি আমাদের নারীসমাজকে এই ভণ্ড, ভ্রান্ত, ভোগসর্বস্ব জীবন থেকে বেরিয়ে এসে ভারতবর্ষের সুমহান আদর্শকে সামনে রেখে আগামী ভারতবর্ষ নির্মাণের কাণ্ডারি হতে হবে। □

সন্দেশখালিতে আক্রান্ত ইডি
এটাই কি পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন ?

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

পুলিশি তৎপরতা, তাদের কাজের কৌশল, কৃতিত্ব নিয়ে কম নন ফিকশন লেখা হয়নি। টিমথি ইগানের ব্রেকিং ব্লু, ড্যানি স্মিথের নাথিং লেফট টু প্রুভ, সাইমন গিলার্ডের লাইফ সেনটেন্স কিংবা জাস্টিন ফোর্ডের দ্য গুড কপ বা এমন আরও বেশ কিছু। যত ফিকশন ও নন-ফিকশন দেশে এবং দেশান্তরে পুলিশকে নিয়ে রচিত তাতে কর্মণ্য রূপ এবং সমাধানি আবেদনেই পুলিশ উপস্থিত। এবার সময় এসেছে অন্য এবং এক অতি সত্য রূপের পুলিশ প্রশাসন এবং ইন্টেলিজেন্স বিষয়ে বই লেখার। যে বইতে এ-মলাট থেকে ও-মলাট পর্যন্ত শুধুই থাকবে এ রাজ্যের অকৃতার্থ, পদে পদে নিষ্ক্রিয় এবং শাসক দলের পদলেহনে অভ্যস্ত অপদার্থ পুলিশের কাহিনি। আজ বড্ড অভাব বোধ করছি পঞ্চানন ঘোষালের। পর পর পুলিশ কাহিনী লিখে যান যিনি। আজকে থাকলে, বিশেষ করে ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালির ঘটনা জ্ঞাত হলে তিনি পুলিশি অপদার্থতার ডাইরি না করে নির্ঘাত থাকতে পারতেন না। পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের যে সংবাদপত্রই খুললাম ৬ জানুয়ারি, শিরোনাম সন্দেশখালি। কুখ্যাত হলো আরও একটা নাম। যে ঘটনা দেখল সারা দেশ, তা নজিরবিহীন।

রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে সন্দেশখালি গিয়ে ওই দিন প্রবল বিক্ষোভ আক্রমণের মুখে পড়েন ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট) আধিকারিকরা। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ শেখ শাজাহানের বাড়িতে তদন্তের স্বার্থে আধিকারিকরা ঢুকতে চাইলেই তাদের ওপর বেনজির ভাবে হামলা করে শাজাহানের অনুগামীরা। তল্লাশি তো দূরের কথা অফিসারদের ল্যাপটপ থেকে মোবাইল ছিনিয়ে তাদের ওপর চলে শারীরিক নিগ্রহ। দু'জন আধিকারিক গুরুতর জখম হন। বাদ যায়নি সংবাদ কর্মীরাও। সংবাদকর্মী এবং ইডি আধিকারিকদের গাড়ি ভাঙচুর হয়। এলাকায় ৮০০০-১০০০ লোক জড়ো হয়ে গুণ্ডার মতো আচরণ করে। শুধু কি এই! সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা শাজাহানের বাড়িতে ইডি ঢুকতে গেলে তৃণমূল কর্মী অনুগামীরা নিরাপত্তায় থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীকেও ছেড়ে কথা বলেনি। তাদেরও ধাক্কা মারধর করে তৃণমূল আশ্রিত গুণ্ডারা। তারপর কী ঘটল? কী বলল রাজ্য প্রশাসন? কারোর তরফ থেকে একটা সৌজন্যমূলক দুঃখ প্রকাশ, ইডি অফিসার এবং সংবাদ কর্মীদের খবর নেওয়া, সহানুভূতিশীল ভদ্রতা এবং পুলিশের দিকে আঙুল তোলা লেশমাত্র দেখলাম না।

এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার পরে রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর কোনো শব্দ উচ্চারণ হয়নি। তাঁর মুখপাত্র রূপে হাজির হলে মন্ত্রী শশী পাঁজা। যিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন— ওরা সবাই স্থানীয় মানুষ। এবং ইডি ওদের উত্ত্যক্ত করছিল। ইডির তরফে প্ররোচনার কারণেই ওরা উত্তেজিত এবং বিক্ষুব্ধ। মাননীয়া মন্ত্রীর কাছে একটাই প্রশ্ন; কোনো তদন্ত ছাড়াই, পুলিশ রিপোর্ট জমা হওয়ার আগেই তিনি কোন মন্ত্রবলে জটিল নিন্দনীয় ঘটনার এমন সরলীকরণ করে ফেললেন? যদি ধরেই নিলাম ইডি আধিকারিকের তরফে সন্দেশখালি থানায় ই-মেইল মারফত জ্ঞাপন করা হয়। বসিরহাট পুলিশ সুপার জে বি টমাস থেকে থানার বড়োবাবু, সেজবাবু এবং সব বাবুরা কি কেবলমাত্রই অভিষেকের নবজোয়ার কিংবা তৃণমূলের অনুষ্ঠান কর্মসূচিতে নিবিষ্ট থাকেন? তাই থানার থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে যখন এমন নির্লজ্জ প্রশাসন বেআব্রু হয়, তখনও দোষ দেখা যায় না ঘোটালায় পতিত রাজ্য শাসনের, ইডি আধিকারিকদের দোষ এটাই যে তারা তাদের কর্তব্য করতে যাচ্ছেন এবং তা তৃণমূলের বিচারে মৌচাকে ঢিল। ইডি এর আগেও বহু রেইড এবং তদন্ত এ রাজ্যের রাঘববোয়ালের বাড়িতে করেছে। তখন কিন্তু এহেন নখাগ্র দেখিনি। বিষয় শেখ শাজাহান— যার দখলে এক বিস্তীর্ণ এলাকা। ভেড়ি থেকে

ভোট সবের মালিক যে। সে যে ভোট লুঠেরা। এমন মেশিনারিকে যেন কেউ স্পর্শ না করে। তাই তৃণমূলের আঞ্চলিক জেলা ভিত্তিক ধ্বজাগ্রকেয়ূরী রক্ষার্থে শাজাহান বাঁচাও অভিযান ছিল ৫ জানুয়ারি।

এ র‍্যাজ্য 'পাপেরে দেখেছি নানা ছলে'। তৃণমূল নেতার সামনে বারবার উর্দিধারী পুলিশের ভীরুতাপুঞ্জ, স্থানীয় থেকে উঁচু নেতার আওয়াজে-হুংকারে উদ্ধত অন্যায়, যা বারবার প্রশাসনিক সভ্যতা শাসনের সাধুত্বকে বিদীর্ণ করেছে। পুলিশ উর্দি ধরে কখনও তৃণমূলের চোটপাটে টেবিলের তলায়, তো কখনও মাথা নত করে স্থানীয় কেষ্ট বিস্টুর গালি হুমকি শুনছে। কিন্তু সন্দেশখালির এই ঘটনার পর এটুকু স্পষ্ট পশ্চিমবঙ্গের উন্মত্ত দুর্দিন ক্রমাগত চলবে যদি না সাংবিধানিক বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। প্রশাসনিক এবং নৈতিক কর্তব্য পালন না করাটা এ রাজ্যের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে বলেই আজ কর্তব্যরত ইডি আধিকারিকদের তৃণমূলের হাতে রক্তাক্ত হতে হচ্ছে। পুলিশ যে নিষ্ক্রিয় থাকে, তা কি কেবল আমি বলছি! এ উবাচ ছিল তৃণমূলের আরাবুল ইসলাম থেকে শওকত মোল্লার। গত বছর জুলাই মাসে যখন আরও একবার সংবাদ শিরোনাম দখল করল পশ্চিমবঙ্গ। সেবার ছিল ভাঙর। কারণ সেখানে মুড়িমুড়কির মতো বোমা-গুলি চলছে। দুষ্কৃতীদের মুক্তাঞ্চল। ১৪৪ ধারা জারির পরেও উত্তপ্ত ভাঙর। গুলিতে আহত তৃণমূলেরই জয়ী প্রার্থী হাতেম মোল্লা। সেদিনও পুলিশি অপদার্থতার কথাই সামনে আসে।

এতদিন সন্ত্রাস হয়েছে, রাজনৈতিক তাণ্ডব চলেছে, দুর্বলের ওপর অত্যাচার করেছে শাসকদল। প্রশাসনিক উদাসীনতা এবং অতি রাজনীতীকরণে ধিক্কার উঠেছে। কিন্তু তদন্তশীল আধিকারিকদের ওপর উদ্দেশ্য সহযোগে হামলা এবং তার পরেও শাসক দলের তাকে সমর্থন নিঃসন্দেহে রাজ্য ব্যবস্থার বিষ নিঃশ্বাসের প্রমাণ দিল। কোথা থেকে পেল তৃণমূল এ সাহস এবং কীভাবেই-বা তারা নিশ্চিত হলো যে তাদের এই দুষ্কর্ম নিন্দিত হবে না? কোনো দুষ্কর্মী হাজত যাবে না, বরং প্রশাসনিক সুরক্ষা পাবে এবং তৃণমূলি আদরতো বটেই। সে নিশান যে একদিন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই দিয়েছিলেন। ২০১৯-এর ফেব্রুয়ারির শুরুটাও অতি নাটকীয় হলো যখন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারের বাড়িতে সিবিআই হানার প্রতিবাদে ধর্মতলায় ধরনায় বসলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবং সার্ভিস রুলকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে ধরনা মঞ্চে এলেন রাজীব কুমার। তারপর অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রীর বচন ছিল--- ওটা ধরনামঞ্চ না। রাজনৈতিক মঞ্চ না। ওটা ছিল 'সত্যাগ্রহ'।

আজকেও তবে কর্তব্যরত ইডি আধিকারিকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে একটা অরাজনৈতিক 'সত্যাগ্রহ' করার দায় বর্তায় পুলিশ মুখ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর। এবং রাজ্য ইন্টেলিজেন্স যে লবডঙ্কা (তা সে তৃণমূলের অঙ্গুলি হেলনে বা কর্ম নিষ্ক্রিয়তায়) তাও স্বীকার করা হোক। সেদিনও রাজীব কুমারে বাড়িতে সিবিআই ঢুকতে চাইলে রাজ্য পুলিশ তাতে বাধা হয়। হাতাহাতি চলে এই পুলিশ (রাজ্য) এবং ওই পুলিশে (সিবিআই)। এমন ঘটনাও দেশে সম্ভবত প্রথমবার। সন্দেশখালির ঘটনা আরও বহুধাপ অধঃপতিত কিন্তু এও এক রেকর্ড লজ্জার ঘটনা দেশের ইতিহাসে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক দল এবং সরকার তৃণমূল কর্মী এবং সাধারণ মানুষকে অতি ধূর্ততার সঙ্গে বার্তা দিতে চাইছে কেন্দ্রীয় যে কোনো সংস্থা তৃণমূল তথা রাজ্যের বিনষ্ট সাধন করতে চায়। কেন্দ্রীয় সংস্থাকে একরকম ভিলেন প্রতিপন্ন করেই ছেড়েছে তৃণমূল। এবং দায়িত্ব নিয়ে স্থানীয় মানুষকে উত্তেজিত করে বিদ্বেষমূলক বার্তা দিচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে। তদন্তকারী সংস্থা কর্তব্য করলেই তাতে রাজনৈতিক মোড়ক দিচ্ছে তৃণমূল। নিজেদের সিমপ্যাথি কর্নারে আনছে।

এতদিন পর্যন্ত বিষয়টা রাজনৈতিক কাদা ছোঁড়াছুড়ির অবস্থানে ছিল। রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে বিদ্বেষী ভাষণ আসত। পার্থ, কেষ্ট, জ্যোতিপ্রিয় কিংবা কালীঘাটের কাকু বা আরও এ, ও, সে— কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জালে ধরা পড়েছে। হয়তো আরও অনেকে ওয়েটিং লিস্টে রয়েছে। কিন্তু তা বলে সরাসরি ভোট মেশিনারির বাড়িতে হানা! কোনো চান্স ছাড়ল না তাই তৃণমূল। স্থানীয় তৃণমূল ঝান্ডাধারী এবং দুষ্কৃতীদের ফ্রিহ্যান্ড দিল প্রশাসন। এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিকদেরও এক শীতল বার্তা : চ্যালেঞ্জ নিবি না। এই নিবন্ধ প্রস্তুত করতে এবং পাঠ করতে যে কোনো সভ্যমানুষকে লজ্জায় আত্মগোপন করতে হবে। একটা সময় ছিল যখন কুমায়ুনের প্রান্তে শোকা নামক জাতি ছিল। তিব্বতিদের ভয়ে ও উপদ্রবে তারা সিঁটিয়ে থাকত। ব্রিটিশরা সেই যুগেও দুঃখ প্রকাশ করত যে তারা তাদের প্রদেশের শোকাতুর মানুষদের রক্ষা করতে পারছে না। প্রশাসনিক দুর্বলতার কথা স্বীকার করেছেন স্বয়ং ল্যান্ডর সাহেব। আবার এক শতাব্দী পর যদি প্রশাসনিক অধর্মের কথা এ রাজ্যে লিখতে বলা হয় তখন কি রাজ্য প্রশাসন এটুকু স্বীকার করতে পারবে— তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে স্থানীয় নেতাদের দৌরাত্বে রাজ্য পুলিশ ভিজে বিড়াল? তারা তৃণমূল নেতার জন্য জো-হুজুর করে। বাকি সময় শীতঘুমে।

Lawless State বলতে গেলেই লিব্যারাল এবং অতি অবশ্যই তৃণমূলের হোমরা চোমরারা উত্তরপ্রদেশের উদাহরণ আনে। কারণ ওখানে গুন্ডা পালালে তাকে এনকাউন্টার করার তথ্য রয়েছে। আর আমাদের রাজ্যের মহামান্য শীর্ষ আদালতের বিচারপতি রাজশেখর মান্থা বলেন, 'রাজ্যের পুলিশের কাজ সিভিক ভলান্টিয়াররা করছে...'। আমাদের রাজ্যে পুলিশকে খোলা মাঠে হুমকি দেয় তৃণমূলের নেতারা। তারপরেও পুলিশ মন্ত্রী একজন নেতাকেও ধমক দেন না। তাই আইন কার দখলে তার ইঙ্গিত বার বার দিয়েছেন পুলিশ মন্ত্রী তথ্য মুখ্যমন্ত্রী। সন্দেশখালির এই সন্ত্রাস নজিরবিহীন হতে পারে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যে সন্ত্রাসী দৌরাত্ম্যে অসম্ভব বলে কোনো শব্দ নেই তা আবারও প্রমাণিত।

প্রশাসনিক শৃঙ্খলতার এবং কর্তব্যের উপবাস চলেছে এ রাজ্যে। তদন্তকারী সংস্থা রাজ্য নিদ্রার কালেই তাদের কাজ করতে হাজির। তাই রাজ্য সরকার ও প্রশাসন এবং রাজনৈতিক দল তৃণমূল বড্ড অসংযত স্পর্ধা প্রদর্শন করছে। স্পর্ধা প্রয়োগ এতটাই সীমাহীন হলো সন্দেশখালিতে যে অহোরাত্র এই রাজ্যবাসী হিসেবেই ধিক্কার জানাই। দুর্বৃত্তায়ন এতদিন পুনরাবৃত্ত হয়ে রাশিকৃত হচ্ছিল, সন্দেশখালি দুষ্কর্মের শিরোমণি হয়ে উঠল। □

লাউগ্রাম পশপুরের সেতার ও তানপুরা নির্মাণ শিল্পী গণেশচন্দ্র রায়

অসীম কুমার মিত্র ॥ হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া বিধানসভার রসিদপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পশপুর গ্রাম। যাকে অনেকেই লাউ গ্রাম বলেই চেনে। এই গ্রামের বাসিন্দা গণেশচন্দ্র রায় একজন স্বনামধন্য লাউ চাষি। যিনি লাউ চাষি থেকে বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ শিল্পীর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। লাউ চাষ থেকে লাউয়ের তৈরি বাদ্যযন্ত্র সেতার, তানপুরা, বীণার টিউনার ছিলেন তিনি। ব্যবসা সূত্রে গণেশবাবুকে প্রায়ই যেতে হতো কলকাতা ছাড়াও দিল্লি, মহারাষ্ট্র, প্রয়াগ, লক্ষ্ণৌ, পঞ্জাব প্রভৃতি জায়গায়। সে সময় মহারাষ্ট্রের পান্ধারপুরে তানপুরা-সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র তৈরির উপযুক্ত লাউ পাওয়া যেত। তিনি মহারাষ্ট্রের মিরাজ (সাংলীপুর) থেকে লাউয়ের বীজ এনে এখানকার বীজের সঙ্গে ক্রসব্রিড পদ্ধতিতে উন্নত জাতের লাউ তৈরি করেছিলেন। তিনি বলেন, তাঁর তৈরি পশ্চিমবঙ্গের এই লাউ মিরাজকে টেক্কা দিয়েছিল। এমনকী সেই সময় তানপুরা বা সেতার তৈরির জন্য মিরাজের লাউ কেউ আর সেভাবে কিনত না।

আগে দামোদরের পূর্ব পাড়ে অবস্থিত হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়া থানার পশপুর, রঞ্জপুর, চকগড়া, পালিয়াড়া (হাওড়া জেলা) গ্রামে ব্যাপকহারে হতো এই লাউ চাষ। এখন আর সেভাবে না হলেও তানপুরা বা অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র তৈরির জন্য এই লাউ এখন পশপুর গ্রামেই বেশি চাষ হয়। গণেশবাবুর কথায়, আগে যেসব জমিতে ব্যাপকভাবে লাউ চাষ হতো, সেই সব জমির অধিকাংশ অংশেই এখন বিকল্প বা অন্য চাষ করতে হচ্ছে। সেতার, তানপুরা তৈরির জন্য এই লাউয়ের খোল (তুম্বা) এখনও বিক্রি করেন তিনি, তবে খুবই অল্প-স্বল্প।

এগুলির বিভিন্ন মাপ বা সাইজ সম্পর্কে তিনি জানালেন লেডিজ তানপুরা ৪৭ বেড় (বি-ফ্ল্যাট), সি-সার্ফ বাড়ে তিন তানপুরা (৫৮-৬০ বেড়), সুর বাহার (৫০-৫৩ বেড়)— এর সাইজ জানাতে ভুললেন না ৮২ বছর বয়সি এই শিল্পী মানুষটি। তিনি আরও জানালেন এই লাউ থেকেই প্রস্তুত হয় ইন্ডিয়ান মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট প্রোডাক্ট। লাউ থেকে তৈরি করা হয় সেতার, তানপুরা, বীণা (বার্তা বীণা, রুদ্র বীণা, সরস্বতী বীণা), একতারা, সুরবাহার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র।

এই বাদ্যযন্ত্রগুলি সম্পর্কে তার ধারণা যে কত স্পষ্ট, তার বক্তব্যে ঘটে তার প্রতিফলন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মোট দ্বাদশ (১২) স্বর আছে যেগুলির দ্বারা সংগীত জগৎ পরিচালিত হয়। তার মধ্যে শুদ্ধ স্বর সাতটি, পাঁচটি বিকৃত স্বর। এই দ্বাদশ স্বরকে নিয়ন্ত্রণ করে যে, তার নাম তানপুরা। তানপুরা ও সেতারের মধ্যে তফাত সম্পর্কে বললেন, তানপুরা তৈরিতে লাগে বড়ো লাউয়ের সঙ্গে ঘোড়া নিমকাঠের মোড় বা সংযুক্তি ও ৪-৬টা তার। সুর নিয়ন্ত্রণ করে সেতার। সেতার তৈরিতে লাগে মোটা লাউয়ের সঙ্গে ঘোড়া নিমকাঠের মোড় ও ২২টা তার। সেতারে সব গানই বাজানো যায়। সেতার এমন একটি বাদ্যযন্ত্র যাকে আজও কেউ অকেজো করতে পারেনি। তেমনই গানবাজনা শিখতে হলে তানপুরাকে অবশ্যই সঙ্গী করতে হবে।

দামোদর বাঁধের পূর্ব পাড়ে অবস্থিত পশপুর বাংলো। বাংলোর কিছুটা আগে পূর্ব দিক বরাবর একটি ঢালাই রাস্তা নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। এই রাস্তা ধরে কিছুটা গেলেই গণেশবাবুর বাড়ি। গ্রামের সকলেই তাঁকে একডাকে চেনে। তিনি জানালেন, 'বাবার আমল থেকেই আমাদের লাউ চাষ শুরু। সেসময় আমাদের প্রায় ১০ বিঘা জমিতে লাউ চাষ করা হতো। এখন বাজার বেশ মন্দা, খুবই সামান্য অংশে লাউ চাষ করতে হয়েছে। লাউয়ের কদর আর আগের মতো নেই। এখন এই ব্যবসা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। আমাদের দুর্দশার সীমা নেই, খেতে পর্যন্ত পাচ্ছি না এখন'। খুবই আক্ষেপের সঙ্গে কথাগুলি বলেন গণেশবাবু।

গণেশবাবু জানান, লাউ থেকে তৈরি সেতার, তানপুরা বা অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সেই সোনালি অতীত আজ আর নেই। বর্তমানে ইলেক্ট্রনিক ইন্সট্রুমেন্টের দাপটে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে বঙ্গীয় প্রযুক্তিতে তৈরি লাউয়ের সেতার, তানপুরা বা বীণার মতো বাদ্যযন্ত্রগুলি, যা খুবই চিন্তার বিষয়। কথায় কথায় গণেশবাবু জানালেন পণ্ডিত রবিশঙ্করই হচ্ছেন সেতার শিল্পী রূপে তাঁর কাছে আদর্শ। তিনি বলেন, পণ্ডিতজী ভারতের বাইরে লন্ডন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গিয়ে লাউ নির্মিত বাদ্যযন্ত্রগুলিতেকে জনপ্রিয় করে তোলেন। সে প্রায় আজ থেকে ৫০ বছর বা তার আগে। সেসময় এক অনুষ্ঠানে পেয়েছিলেন পণ্ডিত রবিশঙ্করের সান্নিধ্য। নন-ম্যাট্রিক গণেশবাবুর কলকাতার সাউথ সিটিতে দোকান ছিল। বারাণসীর লছমিকুণ্ডে দিলীপ শর্মার দোকানেও কাজ করেছেন বেশ কিছু দিন। ওই সব জায়গায় থেকে বিভিন্ন এলাকায় লাউ সরবরাহ করতেন। পরে কোনো এক সময়ে প্রয়াগের সরমন্দিরে লাউয়ের এক প্রদর্শনীতে গিয়েছিলেন আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে। কয়েক বছর আগে লন্ডন থেকে বিদেশি সাংবাদিকরা বাদ্যযন্ত্রগুলি সম্পর্কে সাক্ষাৎকার নিতে এসেছিলেন গণেশবাবুর গ্রামের বাড়িতে। এহেন একজন কৃতী শিল্পী আজ পর্যন্ত কোনোরকম সরকারি স্বীকৃতি পাননি। পাননি কোনো সরকারি অনুদান বা ভাতা। জোটেনি সংবর্ধনাও! তিনি থেকে গেলেন একজন অবহেলিত শিল্পী হিসেবেই!

(সৌজন্য আলিপুর বার্তা)

বাস্তববুদ্ধি

এক ঝিলে অনেক মাছ, ব্যাং ও কচ্ছপের সঙ্গে থাকতো দুটি প্রকাণ্ড রুইমাছ। মাছদুটির একটির নাম শতবুদ্ধি, অন্যটির সহস্রবুদ্ধি। এদের সকলের সঙ্গে

বন্ধুত্ব ছিল। অবশ্য সবচেয়ে বেশি বন্ধুত্ব ছিল ঝিলের ধারে গর্তের বাসিন্দা এক ব্যাঙের সঙ্গে। ব্যাংটির নাম একবুদ্ধি। ঝিলটা অনেক দিনের পুরনো। ঘন কালো জলে অন্যান্য মাছের সঙ্গে রুইদুটি দাপাদাপি করে বেড়াত। সেখানে কোনো বিপদের ভয় ছিল না।

একদিন, তখন বিকেল শেষ হয়ে আসছে। রুইদুটি তখন জলের কিনারায় এসে বন্ধু একবুদ্ধির সঙ্গে গল্প করছে। এমন সময় ওই পথ দিয়ে একদল জেলে যাচ্ছিল। তাদের কাঁধে বড়ো বড়ো জাল। কারও মাথায় চুপড়িতে অনেক মাছ। ঝিলের কাছে এসে দুটি বড়ো রুইমাছ দেখে তারা বলে উঠল, কাল সকালে এখানে জাল ফেলতে হবে। বড়ো বড়ো মাছ রয়েছে।

জেলেরা চলে গেলে ব্যাং বলল, শুনলে তো তোমরা জেলেদের কথা? আমার তো ভয়ে বুক শুকিয়ে যাচ্ছে। এখন কী করা যায় বলতো? এখানে থাকাটা উচিত হবে না। সহস্রবুদ্ধি হেসে বলল, বন্ধু ভয় নেই। জেলেদের কথায় এতদিনের পুরনো বাড়ি ছেড়ে আমরা পালাবো কেন? দেখো, ওরা এই ঝিলে জাল ফেলতে আসবেই না। আর যদি আসেই, আমরা তো জলে সাঁতার কাটার হাজার রকম কৌশল জানি। ঠিক কায়দা করে পালিয়ে যাবো। ওরা কিছুই করতে পারবে না।

শতবুদ্ধি বলল, তুমি ঠিক বলেছ। আমারও সাঁতারের একশোরকম কায়দা জানা আছে। ভাই একবুদ্ধি, তুমি এত তাড়াতাড়ি ভয় পাও কেন? দেখো, বুদ্ধি দিয়েই জীবনটা বাঁচাতে হয়। তোমাকে এই ভিটে ছেড়ে কোথাও পালাতে হবে না। এখন নিশ্চিন্ত হও।

ব্যাং বলল, আমার নামই একবুদ্ধি আর আমার একটাই বুদ্ধি। সেই বুদ্ধি বলে দিচ্ছে, কাল জেলেরা আসবেই, তাই পালানোর কথা চিন্তা করাই মঙ্গল। এই ঝিলের পুবদিকে একটা নালা আছে। সেটা দিয়ে পাশের পুকুরে অনায়াসেই যাওয়া যায়। আজ রাতে আমি আমার পরিবার পরিজন নিয়ে সেখানে চলে যাব। তোমরাও ভাই চলো আমার সঙ্গে। তারপর না হয় সবকিছু ঠিক হয়ে গেলে ফিরে আসব এই ঝিলে।

সহস্রবুদ্ধি অনেক অভয় দিল একবুদ্ধিকে। একবুদ্ধি কিন্তু বন্ধুদের কথায় কোনো ভরসা পেল না। দুশ্চিন্তায় দিন কাটানোর চেয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়াই ভালো। তাই সেই রাতেই একবুদ্ধি পরিবার পরিজন নিয়ে পাশের পুকুরে চলে গেল।

পরদিন সকাল হতেই জেলেরা কাঁধে বড়ো বড়ো জাল নিয়ে সেই ঝিলে নেমে পড়ল। সমস্ত ঝিল জুড়ে জাল ছড়িয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে টানতে লাগল। তখন জলের মধ্যে সমস্ত মাছের ছোটাছুটি দাপাদাপি পড়ে গেল। ঝিল জুড়ে শুরু হলো তোলপাড়। তাই দেখে জেলেদের কী আনন্দ।

জালে আটকা পড়ে শতবদ্ধি, সহস্রবুদ্ধি কতরকম কায়দা করে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করতে লাগল। প্রকাণ্ড লাফ মেরেও তারা বিফল হলো। শেষে জালে বন্দি হয়ে পড়ল। জেলেরা জাল টেনে উপরে তুলল। জালে অজস্র মাছের সঙ্গে শতবুদ্ধি, সহস্রবুদ্ধিও ধরা পড়ল। ছোটো মাছগুলি চুপড়িতে নিয়ে বড়ো দুটি রুইমাছের একটিকে একজন ঝুলিয়ে নিল কাঁধে, আরেকজন নিল হাতে। তারপর আনন্দে তারা বাজারের দিকে চলল।

পাশের পুকুরের পাড় ধরে জেলেরা ফিরছে দেখে একবুদ্ধির বউ বলল, দেখো গো, তোমার বন্ধুদের দুর্দশা। মনের দুঃখে একবুদ্ধি বলল, কী আর দেখবো বলো! এরকম হবে তা আমি জানতাম। শুধু বুদ্ধিমান হলেই হবে না, বাস্তববুদ্ধিও থাকতে হবে। ওরা আমার কথা শুনল না, এটাই দুঃখের। ওরা শতবুদ্ধি আর সহস্রবুদ্ধি হয়েও মারা পড়ল আর আমি একবুদ্ধি হয়েও পরিবার পরিজন নিয়ে বেঁচে গিয়ে কেমন আনন্দে আছি।

পৃথ্বীরাজ সেন

বীর বনবাসী

কোমরাম ভীম

কোমরাম ওরফে কুমরাম ভীম ছিলেন হায়দরাবাদ অধুনা তেলেঙ্গানা রাজ্যের গোণ্ড জনজাতির একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি ১৯০১ সালের ২২ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। জনজাতি অধ্যুষিত জঙ্গলের মধ্যে গ্রামে বড়ো হয়ে ওঠেন। ব্রিটিশ আধিকারিকরা জঙ্গল থেকে জনজাতিদের উৎখাত করতে শুরু করলো তাঁর বাবা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ব্রিটিশ পুলিশ গুলি করে তাঁর বাবাকে হত্যা করে। বাবার মৃত্যুর পর কোমরাম জনজাতি যুবকদের সংগঠিত করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৯২০ সালে ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষক নিজামশাহির এক পদস্থ আধিকারিককে হত্যা করেন। প্রচণ্ড লড়াইয়ে তিনি প্রায় সাত বছর জঙ্গল থেকে ব্রিটিশদের প্রতিহত করে রাখেন। ১৯৪০ সালে ব্রিটিশ পুলিশ তাঁরে গ্রেপ্তার করে। জেলখানায় ভীষণ অত্যাচারের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়।

এসো সংস্কৃত শিখি– ৬

এষঃ – এই (পুং), **এষা**– এই (স্ত্রী), **এতৎ** –এটা (ক্লীব)

পুংলিঙ্গে

এষঃ কঃ ? — এ কে?

এষঃ বালকঃ — এ বালক।

এষঃ কঃ ?— এষঃ ছাত্রঃ।

এষঃ— ?— এষঃ পুরুষঃ।

– **কঃ ?**— এষঃ গায়কঃ।

— — ?— এষঃ শিক্ষকঃ

অভ্যাস করি—

বিমলঃ, শঙ্করঃ, প্রশান্তঃ। দীপকঃ, সৈনিকঃ, চিকিৎসকঃ, দেশভক্তঃ, নায়কঃ, পুরোহিতঃ, সৌচিকঃ, সেবকঃ, কুম্ভকারঃ।

ভালো কথা

নিমন্ত্রণ

বাড়ি বাড়ি নিমন্ত্রণ করা চলছে। নিমন্ত্রণপত্র আর সঙ্গে প্রসাদ। প্রতিদিন দল বেঁধে বাড়ির দরজায় গিয়ে জয় শ্রীরাম বলে দাঁড়ালেই বাড়ির লোক এলে তাদের হাতে ওগুলি দেওয়া হচ্ছে। আমরা ছোটো তাই আমাদের যাওয়া বারণ। দাদা দু'দিন বাবার সঙ্গে গিয়েছিল। আমি প্রতিদিন সন্ধ্যায় মা, পাশের বাড়ির কাকিমা, জেঠিমা আর দিদিদের সঙ্গে প্রসাদী চালে (অক্ষত) ঘি আর হলুদ মাখিয়ে প্যাকেট তৈরি করছি। মা বলেছে এটাও শ্রীরামের কাজ। বাবা বলেছেন মার্চ মাসের পরে আমরাও অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দির দর্শন করতে যাব।

বিদিশা মহান্তি, ষষ্ঠশ্রেণী, বরাবাজার, পুরুলিয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

শীত

সেবন্তী রায়, একাদশ শ্রেণী, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরগনা।

গুটি গুটি পায়ে শীতবুড়ি এল
সঙ্গেতে খেজুর রস নলেন গুড়ও এল।
তার সঙ্গে নানা রঙের টুপি সোয়েটার
দেখাতে ব্যস্ত সবাই নিজ নিজ বাহার।
পথশিশুর নাই টুপি নাই সোয়েটার
এই শীতে থরথর কাঁপে সারা রাত।
এই শীত খুবই মজা টাকা আছে যার
গরিবেরা জানে শুধু শীতের কী মার।

লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা ই-মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

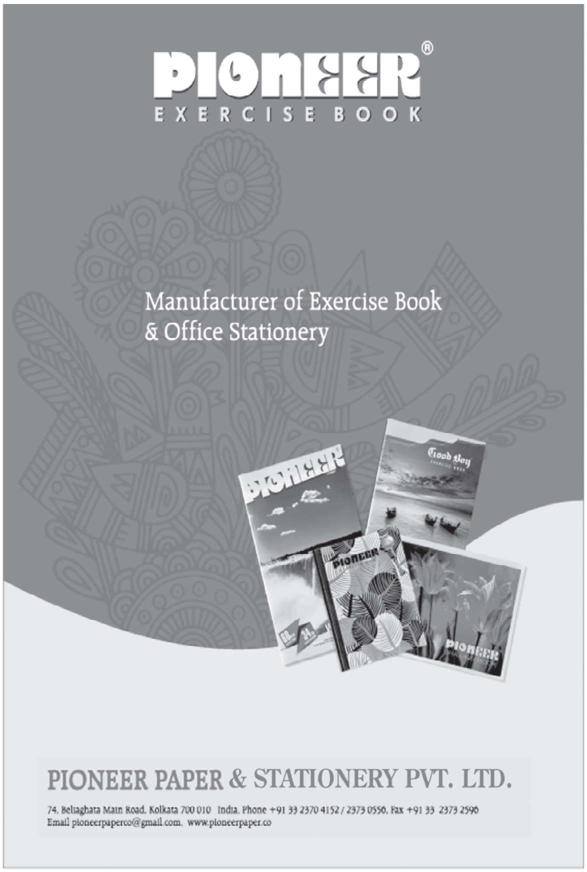

With Best Compliments from -

A

Well wisher

হিমালয় অঞ্চলের উন্নয়ন যেন দুষণে গিয়ে না ঠেকে

গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের দেশের সমগ্র উত্তরভাগ জুড়ে হিমালয়ের অবস্থান বিপুলভাবে ভারতের প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগৎকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। আমাদের দেশের জলবায়ুর নিয়ন্ত্রক যেমন হিমালয় তেমনই দেশের সমস্ত বড়ো নদীগুলি হিমালয়ের বরফগলা জল ও বৃষ্টি আনা জলে পুষ্ট হয়ে নিজেদের অববাহিকায় শস্য ফলিয়ে সমগ্র ভারতকে পুষ্ট করেছে, বিকাশ ঘটিয়েছে এক এমন সংস্কৃতির যার শ্রেয় নিজেদের বলে প্রমাণ করতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশও সর্বদা নানাভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীর আর কোনও দেশেই আমাদের মতো অতুলনীয়ভাবে বিন্যস্ত স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ সমৃদ্ধ বর্ণমালা নেই, নেই সংস্কৃতভাষা বা সপ্তসুরকে আশ্রয় করে রচিত মার্গসংগীতের অতুলনীয় সমৃদ্ধ জগৎ। ভারতের সংস্কৃতির মূল স্বরূপ বৈদিক সাহিত্য ও জ্ঞানের আকরস্বরূপ মন্ত্রাবলীও আর কোনও সংস্কৃতিতেই নেই যেগুলির উদ্‌গম ও বিকাশ ঘটেছিল হিমলায়েই।

হিমালয় এই পৃথিবীর সব পর্বতমালার মধ্যে বয়সে নবীনতম এবং স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত না হওয়ায় এখনও উচ্চতা বৃদ্ধি করে চলেছে। বলা হয় উত্তরের এশিয়ার পাত বা প্লেটের দিকে ভারতীয় প্লেট প্রতি বছর অন্তত দুই সেন্টিমিটার করে এখনও এগোচ্ছে। যার ফলে হিমালয়ের সন্তুলন স্থায়ী হচ্ছে না, ঘটছে ছোটো-বড়ো নানা ভূমিকম্প ও তজ্জনিত ধস। খবরের কাগজের এক রিপোর্ট বলছে, গত বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালের বর্ষার কয়েকমাসে শুধুমাত্র উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশেই ঘটেছে ১৪০০-শোর বেশি ধস। আমাদের সর্বদাই মনে রাখা উচিত প্রাকৃতিকভাবে অবস্থিত এই পর্বতমালা যেন আমাদের কোনও ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে নিজের স্থিতাবস্থা হারিয়ে না ফেলে।

হিমালয়ের বিস্তার বরাবর দুটি প্লেটের সংঘর্ষ জন্ম দিয়েছে পশ্চিম সিন্ধুনদের দক্ষিণমুখী বাঁক থেকে পূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণমুখী বাঁক পর্যন্ত বিস্তৃত এক দারণের, যাকে ভূতাত্ত্বিকেরা মেইন বাউন্ডারি থ্রাস্ট নামে অভিহিত করে থাকেন। সেই ফাটল বা দারণের প্রায় সমান্তরালভাবে বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক যুগে সৃষ্টি হয়েছে আরও ছোটো-বড়ো ফাটলের যেগুলি বরাবর শিলাস্তরে প্রায়ই ছোটো-বড়ো স্খলনের সৃষ্টি হয়। সদ্য দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া উত্তরাখণ্ডের চারধাম পকিল্পনার অংশ সিল্কিয়ারা ও ডণ্ডলগাঁওয়ের মধ্যের সুড়ঙ্গটির সিল্কিয়ারা প্রান্তের খুব কাছে রয়েছে মেইন সেন্ট্রাল থ্রাস্ট নামক এক গভীর ও দীর্ঘ দারণ এবং ডণ্ডলগাঁওয়ের কিছুটা উত্তরে রয়েছে ট্রান্স হিমাদ্রি ফল্ট। তবু বহু বিচারবিবেচনা করেও বহু প্রতিবাদ প্রতিরোধ সহ্য করে এক বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে, দেশের সুরক্ষার স্বার্থে এই সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজ চলছে। দেশের সুরক্ষার জন্য সেখানে অন্য কোনও বিকল্প না থাকায় এই সুড়ঙ্গ তৈরি করার অনুমতি পাওয়া

ফ ঃ ৬

যায়।

হিমালয় আমাদের উত্তরের সীমান্ত রক্ষায় যে প্রহরীর কাজ করে সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। তবু উত্তুঙ্গ এই পর্বতমালার ফাঁকে থাকা গিরিপথগুলি চিরকালই সেই দুর্লঙ্ঘ্য সুরক্ষা-প্রাচীরে দুর্বল বিন্দুরূপে রয়ে গিয়েছে। এই গিরিপথগুলি ধরে যেমন স্মরণাতীতকাল থেকে উত্তরের দেশগুলির সঙ্গে স্থলপথে বাণিজ্য হতো বা জ্ঞানী-গুণী পরিব্রাজকদের যাতায়াত হয়েছে, তেমনই আমাদের দেশকে লুণ্ঠন ও আক্রমণ করতে বৈদেশিক শত্রুদের আগমন ঘটেছে। তিব্বতে যতদিন তিব্বতীয়দের রাজত্ব ছিল ততদিন উত্তরের গিরিপথগুলি দিয়ে আক্রমণের শঙ্কা তেমন ছিল না। কিন্তু আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই গিরিপথগুলিকে হামলা চালানোর জন্য ব্যবহার করা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী অঞ্চলেই রয়েছে নিতি ও মানার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি গিরিপথ এবং তা ছাড়াও ছোটো-বড়ো আরও ছয়টি গিরিপথ। সুতরাং সেগুলিকে রক্ষা করার বিষয়টি এখন আর অগ্রাহ্য করা যায় না। এই সুড়ঙ্গটি তৈরি হলে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর মধ্যে পথের দূরত্ব কমে যাবে ২৬ কিলোমিটার, আর সেইসঙ্গে পাহাড় ডিঙিয়ে চলা পথে শীতে জমে থাকা রাড়ী গিরিপথকে পাহাড় সংবৎসর অব্যাহতভাবে সবরকম যান চলাচলের উপযোগী এক পথও পাওয়া যাবে। এই সব বিষয়গুলি-সহ আরও বহু কারণে সুপ্রিম কোর্টের নিযুক্ত করা বিশেষজ্ঞ কমিটির বিরোধিতা এবং উত্তরকাশীর হিমালয় বাঁচাও অভিজ্ঞানের সদস্যদের বিরোধী আন্দোলন সত্ত্বেও দেশের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এই সুড়ঙ্গ খননের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

হিমালয়ের সর্বত্র মানুষের বসবাস ও চলাচলের পথে ধস এবং অন্যান্য বিপজ্জনক জায়গাগুলিতে স্থানীয় লোকেরা দেব-দেবীর মন্দির তৈরি করে অথবা মন্ত্রপূত পতাকা টাঙিয়ে রাখে যাতে মানুষ সেখানে নম্র হয়ে চলে। সুড়ঙ্গের সিল্কিয়ারা প্রান্তের মুখের কাছে ছিল তেমনই এক মন্দির, বওখনাগের মন্দির। সুড়ঙ্গ তৈরির সময় সেই মন্দির ভাঙা পড়েছিল যেটি ধসের ঘটনার পরে আবার তৈরি করে দেওয়া হয়। গোমুখে যাওয়ার পথে একজায়গায় জোরে হাততালি দিলেও পাশের পাহাড় থেকে পাথরের টুকরো নেমে আসে। এমতাবস্থায় নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনও কারণেই হিমালয়ের স্থিতাবস্থাকে বিঘ্নিত করা উচিত নয়। তবু আমরা দেখি তীর্থযাত্রীরা বাসে করে যাচ্ছে উচ্চৈঃস্বরে স্টিরিও বক্সে গান বাজিয়ে। পাহাড়ের পরিবেশ নষ্ট হওয়ার সঙ্গে তীর্থযাত্রার মাহাত্ম্যও সেখানে খান খান হয়ে পড়ে।

ইদানীং উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া এক বিজ্ঞাপনে দেখা গেল রাজ্যে হাই ভ্যালু টুরিজমকে উৎসাহ দিতে পাহাড়ে হেলিকপ্টারে ভ্রমণে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এজন্য পর্যটকদের পাহাড়তলির হেলিপ্যাড থেকে তাদের হোটেলের নিকটতম হেলিপ্যাডে যেতে প্রতি খেপে জনপ্রতি ৫০০ টাকা করে পাবে। এর ফলে অরণ্য ধ্বংস করে গড়া হবে হেলিপ্যাড, হোটেল, রিসর্ট ইত্যাদি। সাফ হয়ে যাবে অরণ্যের পর অরণ্য। লোকে ইতিমধ্যেই বেআইনিভাবে হেলিকপ্টারে যাওয়া শুরু করেছে। সম্প্রতি এক অভিনেত্রীর হেলিকপ্টারে দেবদর্শনে মদমহেশ্বরে যাওয়ার ঘটনাটি খবরে প্রকাশিত হয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সমভূমিতে ৩৩ শতাংশ ও পার্বত্যাঞ্চলে ৬৬ শতাংশ অরণ্য থাকা প্রয়োজন। রিসর্ট, হেলিপ্যাড ইত্যাদি তৈরিতে অরণ্য ধ্বংস ডেকে আনবে আরও ধস এবং আরও প্রদূষণ। তার মূল্য কিন্তু সাধারণ মানুষকেই চোকাতে হবে। হিমালয় তপোভূমি। যুগযুগান্ত ধরে সেই তপোভূমিতে যে সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছিল তা আমাদের দিয়েছে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিন্যস্ত স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ সমৃদ্ধ বর্ণমালা; দিয়েছে সংস্কৃত ভাষা, সপ্তসুরকে আশ্রয় করে রচিত মার্গসংগীতের অতুলনীয় সমৃদ্ধ জগৎ; দিয়েছে বৈদিক সাহিত্য, জ্ঞানের আকরসম মন্ত্রাবলী— যা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। আর্যত্বের দাবিদার অন্য আরও দেশ হলেও সেসব দেশ থেকে লোকে চুপিসারে আসছে হিমালয়ের নিভৃতবাসী ব্রোকপা জনজাতিদের গ্রামে। সেই বিষয় নিয়ে তথ্যচিত্রও তৈরি হয়েছে। তপোক্ষেত্র হিমালয়ের সেই শান্তপরিমণ্ডল কি আমরা রক্ষা করতে পারবো? হিমালয়কে রক্ষা করা হোক শান্তির আশ্রয়, জ্ঞানের উৎসস্থল হিসেবে। সেই রক্ষাকার্যে সুড়ঙ্গ খনন যদি একান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়ে তবে তা যেন শতপ্রতিশত সততা ও সতর্কতার সঙ্গে করা হয়।

সেজে উঠেছে গঙ্গাসাগর মেলা

হীরক কর

গত ৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায় গঙ্গাসাগরে গঙ্গা আরতির সাক্ষী থাকলেন কয়েক হাজার মানুষ। দেশে কুম্ভমেলার পরেই সবচেয়ে বড়ো মেলা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে গঙ্গাসাগর মেলা। আর এই মেলাকে ঘিরে রাজ্য সরকারের আয়োজনে কোনো প্রকার খামতি রাখতে চায় না জেলা প্রশাসন। গঙ্গাসাগর মেলার সময় গঙ্গাসাগরের কপিলমুনি মন্দির প্রাঙ্গণে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের ভিড় হয়। কার্যত মেলার কয়েকটা দিন মিনি ভারতবর্ষে পরিণত হয় সাগরদ্বীপ। সেদিন গঙ্গাসাগর মেলায় গঙ্গা আরতির অপূর্ব দৃশ্য দেখতে কয়েক হাজার মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন গঙ্গাসাগরের পবিত্র বেলাভূমিতে। কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে এই দিনের এই গঙ্গাআরতির আয়োজন করা হয়। বারাণসীর গঙ্গা আরতির পুরোহিত সমাগমে গঙ্গা আরতি সুসম্পন্ন হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের এই গঙ্গা আরতিতে মুগ্ধ হয়েছেন গঙ্গাসাগরবাসী। ৮ থেকে ১৭ জানুয়ারি চলবে গঙ্গাসাগর মেলা। এবার মেলা উপলক্ষে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেলা যাতে ভালোভাবে আয়োজন করা যায় তার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। ভিআইপি-দের খুব প্রয়োজন ছাড়া মেলায় না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনের আগেই হবে গঙ্গাসাগর মেলা। এখানে থেকেই অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন সাধু-সন্ত থেকে মোহন্তরা। ২২ জানুয়ারি বহু আকাঙ্ক্ষিত রামমন্দিরের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী। তার আগেই ১৮ তারিখ নাগাদ অযোধ্যায় পৌঁছে যাবেন কপিলমুনি আশ্রমের প্রধান মোহন্ত জ্ঞানদাসজী। গঙ্গাসাগরের গঙ্গাজলে ধুয়ে দেওয়া হবে রামলালার জন্মভূমি স্থল। মকর সংক্রান্তির দিন ভোরে সেই জল তুলে রাখা হবে সাগরসঙ্গমে।

প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর ভিড় জমে সাগরে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মূলত ট্রেন পথেই গঙ্গাসাগরের উদ্দেশে পাড়ি দেন পুণ্যার্থীরা। তাই পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তায় সুরক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর নির্দেশ দিয়েছে রেল বোর্ড। ইতিমধ্যেই রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান এ বিষয়ে আরপিএফের ডিজি এবং রেলের বিভিন্ন বিভাগীয় সদস্য ও জোনের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন। যাত্রী সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে হাওড়া, শিয়ালদা, কলকাতা-সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে বেশি সংখ্যায় নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছে রেল।

কুম্ভমেলার পরে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মেলা ধরা হয় গঙ্গাসাগর মেলাকে। কপিলমুনি দর্শনের জন্য প্রতিবছর সারা দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর ঢল নামে সাগরে। তার ওপর প্রতিবছর জানুয়ারি মাস জুড়ে বিভিন্ন জেলায় উৎসব-মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। ফলে জানুয়ারি মাসে মেলাগুলোকে কেন্দ্র করে ট্রেনে যাত্রীদের ভিড় থাকে। সেই ভিড়ের মধ্যে কোনওভাবেই যাতে যাত্রীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয় তার জন্য কড়া নির্দেশ দিয়েছেন রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান। রেল সূত্রে জানা গেছে, গঙ্গাসাগর মেলার জন্য স্টেশন চত্বরে

এবং ট্রেনে সুরক্ষার জন্য এক কোম্পানি আরপিএফ মোতায়েন করা হয়েছে। ৯ জানুয়ারি থেকে এই সুরক্ষা কর্মীরা হাওড়া, শিয়ালদা, কলকাতা-সহ অন্যান্য স্টেশনগুলোতে মোতায়েন আছেন। তারা যাত্রীদের নিরাপত্তার ওপরে নজরদারি রাখছেন। এর পাশাপাশি সাদা পোশাকে নজরদারি চালানো হচ্ছে, যাতে ভিন রাজ্য থেকে বহিরাগতরা এসে এখানে গণ্ডগোল করতে না পারে। তার জন্য বিশেষভাবে নজরদারি চালানো হচ্ছে। এছাড়া সিসিটিভি-র মাধ্যমেও নজরদারি চলছে।

গঙ্গাসাগর মেলাকে ঘিরে ট্রেনে নিরাপত্তা এই প্রথম নয়। প্রতিবারই সেখানে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে থাকে রেল। এর পাশাপাশি রাজ্য ও রেল পুলিশের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরাও বিভিন্ন স্টেশনে শিবির করছেন। মহিলা ও শিশুদের উপর বিশেষভাবে নজর রাখা হচ্ছে। তাদের সুক্ষার ওপরে আরও বেশি করে জোর দিচ্ছে রেল। তাছাড়া অসুস্থ হয়ে পড়লে পুণ্যার্থীদের যাতে সরাসরি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্য বড়ো বড়ো স্টেশনগুলোতে প্রতিবারের মতো এবারও অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা থাকছে। বিশেষ করে শিয়ালদা, নামখানা, কাকদ্বীপ, হাওড়া স্টেশনে যেহেতু ভিড় হয় তার জন্য এই স্টেশনগুলোতে অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টার খোলা হয়েছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এই সমস্ত স্টেশনগুলোতে। সেই সঙ্গে বাড়তি ট্রেন চালানো হচ্ছে।

পাশাপাশি কলকাতার বাবুঘাট থেকে সাগরমেলা পর্যন্ত বাসের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে কলকাতা থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত বাফার জোনের সংখ্যাও। সুষ্ঠুভাবে মেলা পরিচালনার জন্য যা যা পদক্ষেপ করা দরকার, জেলা প্রশাসনের তরফে সমস্ত দপ্তরকে সেইমতো এগোতে বলা হয়েছে। কথা হচ্ছিল জেলাশাসক সুমিত গুপ্তের সঙ্গে। কথায় কথায় তিনি জানলেন, মুড়িগঙ্গায় ড্রেজিং শুরু হওয়ার মেলার সময় ১৮ থেকে ২০ ঘণ্টা যাত্রী পারাপার করানো যাবে। ফি বছর গঙ্গাসাগরে মকর স্নান ও গঙ্গাসাগর মেলা ঘিরে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। প্রতি বছরই পুণ্যার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। তাই প্রশাসনের প্রস্তুতিও আরও জোরদার হয়েছে। ১১৫০ সিসিটিভি ক্যামেরা, ২০টি ড্রোন নজরদারি করবে। ১০ হাজার পুলিশ, ৬৫০০ স্বেচ্ছাসেবক রয়েছেন। ২২৫০ সরকারি ও ২৫০ বেসরকারি বাস থাকবে। ৬টি বার্জকেও ব্যবহার করা হবে। বাসের গাইডের ব্যবস্থা করা হবে যাতে তীর্থযাত্রীরা সমস্যায় না পড়ে যান। এদিকে মেলাতে ভিআইপিরা এলে সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়েন। সেকারণে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, পাইলট কার নিয়ে ভিআইপিরা মেলায় আসবেন না।

একাধিক মন্ত্রীকে মেলার তদারকির দায়িত্বে রাখা হচ্ছে। সেই সঙ্গে তিনি বার বার সুরক্ষার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, মেলাতে রান্না করতে দেওয়া হবে না। মেলা প্রাঙ্গণে ৫০টি দমকলের ইঞ্জিন রাখা থাকবে। ২০২৩ সালে বাংলাদেশের একটি জলযান ডুবে যাওয়া প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জায়গাটা ভালো করে দেখে রাখার কথা জানিয়েছেন। এবার মেলায় আসতে পারেন প্রায় ৪০ লক্ষ পুণ্যার্থী।

পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থাতেও জোর দেওয়া হয়েছে। তৈরি হয়েছে ১১টি অস্থায়ী ফায়ার স্টেশন। প্রয়োজনে দমকলের আধিকারিকরা বাইক নিয়ে ঘুরবেন। তাঁদের কাছে থাকবে জল ও ফোন। যাতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটলে দ্রুত তা নেভাতে পারেন।

মেলায় ভিড় নিয়ন্ত্রণ, দুর্ঘটনা মোকাবিলায় এবং নজরদারিতে সাগরদ্বীপের সব পরিবহণে জিপিএস ট্র্যাকার লাগানো হয়েছে। এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কন্ট্রোলরুম থেকে সমস্ত ভেসেল এবং বাসে নজরদারি চালানো হচ্ছে। একইসঙ্গে কুয়াশায় দৃশ্যমানতা কম থাকলে ভেসেল যাতে আটকে না যায়, সে কারণে নেভিগেশন লাইটের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। যেহেতু গতবারের তুলনায় এবার পুণ্যার্থীর সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই শুরু থেকেই পিলগ্রিম ট্র্যাকিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকে কাজে লাগাতে চায় প্রশাসন। বাবুঘাট-সহ সব প্রান্ত থেকে সাগরযাত্রীদের জন্য ব্যবহৃত সরকারি ও বেসরকারি গণপরিবহণে ট্র্যাকিঙের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নজরদারির জন্য চালু করা হয়েছে মেগা কন্ট্রোলরুমও। গতবার মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে গঙ্গাসাগরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার মুখ্যমন্ত্রী মেলা শুরুর প্রথম দিন ৮ জানুয়ারি হাজির হয়েছিলেন গঙ্গাসাগরে।

সারা ভারত থেকে সাগর দ্বীপে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন তীর্থযাত্রীরা। কিন্তু অনিয়মিত ভেসেলের জন্য চরম দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে পুণ্যার্থীদের। মেলার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নিজে কিছু নির্দেশিকা দিয়েছিলেন। জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে প্রস্তুতি নেওয়ার কথা বললেও কার্যত চূড়ান্ত হয়রানির শিককার হতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে।

স্থানীয়রা বলছেন, লট নম্বর আট ও কচুবেড়িয়া জেটিঘাটে ভাটার সময় ছয় থেকে সাত ঘণ্টা ধরে বন্ধ থাকছে ভেসেল পরিষেবা। দীর্ঘ সময় ধরে ফেরি পরিষেবা বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়ছেন যাত্রীরা। এর মধ্যেই যদি পারাপার বন্ধ থাকে, তা হলে বিরাট সমস্যায় পড়বেন সাধারণ মানুষ।

মুড়িগঙ্গা নদীর বুকে জেগে উঠেছে প্রচুর চর। প্রশাসন মেলার পরিস্থিতি ঠিক রাখতে নদীবক্ষে পলি কাটার ব্যবস্থা শুরু করেছে। জেলাশাসক জানিয়েছেন, 'যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে পলি কাটার কাজ চলছে। পুণ্যার্থীদের যাতে কোনও সমস্যার মধ্যে না পড়তে হয়, তার দিকে বিশেষ নজর রাখা হয়েছে।' উল্লেখ্য, এই পথে বহুদিন ধরে একটি ব্রিজ তৈরির দাবি এলাকার মানুষের। প্রত্যেক বছর মেলায় এই সমস্যা একটি বড়ো সমস্যা। প্রথমে দুটি বড়ো মেশিন দিয়ে ড্রেজিঙের কাজ করা চলছিল। রবিবার থেকে আরও অতিরিক্ত একটি মেশিন লাগানো হয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে পলি কাটার কাজ শেষ না হলে সমস্যা আরও প্রবল হতে পারে।

গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে সরাসরি সাহিত্য সেভাবে রচিত হয়নি। যেমন প্রয়াগের মেলাকে ঘিরে রচিত হয়েছে কালকূটের 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে'। কিন্তু এটা ঠিক, মেলা নিয়ে যা কিছু লেখা হয়েছে বা মেলার যা কিছু রূপ সেলুলয়েডে দেখানো হয়েছে, তার মধ্যেই কোথায় যেন গঙ্গাসাগর মেলার রূপটাও ধরা পড়েছে। বহু শতাব্দী পরে আজও প্রতি বছর মকর সংক্রান্তির সময় সারা দেশের লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী সুপ্রাচীন এই মহাতীর্থে মোক্ষপ্রাপ্তির আশায় উপস্থিত হন। □

বিজয় আঢ্য॥ ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকে কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনকে যেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, তুলনায় বিশ শতকের প্রথম ভাগে বিপ্লবীদের ভুমিকাকে গৌণ করে দেখানো হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের ক্ষেত্রে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর (১৮৮৬-১৯৪৫) ভূমিকা ছিল প্রধান। কিন্তু ইতিহাসে তাঁর ভূমিকাকে যেন অনেকটাই পার্শ্ব চরিত্র বা সহযোগী যোদ্ধা হিসেবেই দেখানো হয়েছে। ইদানীংকালে রাসবিহারী বসুর ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব নিয়ে দেশে ও বিদেশে গবেষণামূলক কিছু কাজ হচ্ছে। এই ধারাতেই সাম্প্রতিক প্রকাশিত (২০২৩) সায়ন্তন বসুর 'Rash Behari Bose : A Cyclonic Freedom Fighter of Greater East-Asia' গ্রন্থটি নতুন সংযোজন। লেখক তাঁর বক্তব্যের পক্ষে প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে বিভিন্ন তথ্যের উৎস সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, যেমন 'Rash Behari : INA' অধ্যায়ে মাস, তারিখ-সহ ২২টি তথ্যসূত্র দিয়েছেন যা পরিশ্রম সাধ্য। গ্রন্থটিতে অধ্যায়গুলি ক্রমানুসারে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছেন যা রাসবিহারী বসুর জীবনের পর্যায়গুলিকে বুঝতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে চন্দনগরের 'রাসবিহারী রিসার্চ ইনস্টিউট' থেকে সংগৃহীত ছবিগুলি গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছে।

জীবনের শেষ দিকে রাসবিহারী বসুর হিন্দু জাতীয়তা ভাবনার প্রতি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে জীবনের প্রথমভাগে যুবক ডাঃ হেডগেওয়ারের (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা) সঙ্গে রাসবিহারী বসুর পরিচয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেশ করতে না পারলেও পারিপার্শ্বিক কয়েকটি ঘটনার কথা লেখক উল্লেখ করেছেন। ১৯১৪ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে চন্দননগরের মতিলাল রায়ের লেখা একটি চিঠি অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী অতুল ঘোষের কাছে এক মারাঠি যুবকের মাধ্যমে রাসবিহারী বসু পাঠিয়েছিলেন। লেখকের কথায়— 'We do

বৃহত্তর পূর্ব-এশিয়ার দুরন্ত এক স্বাধীনতা সংগ্রামী

not find any other Maratha rovolutionary in calcutta during that time except National Medical School student Keshav' (P. 107)। ১৯১৫ সালে বিদেশ যাত্রার যখন তিনি পরিকল্পনা করছিলেন, তখন নবদ্বীপে কয়েক মাস তিনি এক মারাঠা যুবকের সঙ্গে ছিলেন। লেখকের অনুমান— 'this young man is none other than Keshav Baliram Hedgewar.' (P. 119)। কলকাতায় ডাক্তারি পড়ার সময় কেশবরাও অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসেন এবং সমিতির একজন সংবাদবাহক হিসেবে নিযুক্ত হন। প্রতুল চন্দ্র গাঙ্গুলীর লেখা 'বিপ্লবীর জীবন দর্শন'-এ বলা হয়েছে, তিনি প্রায়ই চন্দননগরে প্রবর্তক আশ্রমে যেতেন এবং সেখানেই রাসবিহারী বসুর সঙ্গে কেশবের পরিচয় হয়। তিনিই কেশবের ছদ্মনাম 'Cochaine Dutta' দেন।

১৯৩০ সালে স্বাতন্ত্র্যবীর বিনায়ক দামোদর সাভারকরজীর সঙ্গে রাসবিহারী বসুর সম্পর্ক হয়। বীর সাভারকরজীর অনুরোধে তিনি জাপানে হিন্দু মহাসভার শাখা প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেই তাঁর সভাপতি হন। ১৯৩৯ সালের মে মাসে 'Indian freedom Struggle Movement' নামে এক প্রবন্ধে ('Toho Koran'-এ প্রকাশিত) লিখেছিলেন- 'Hindu Mahasabha Works on the concept and basis of cultural nationalism (P. 166)। লক্ষণীয়, কেতাবি বিদ্যায় তাঁর কোনও ডিগ্রি না থাকলেও ইংরেজি ও জাপানি ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। 'New Asia' পত্রিকায় তিনি তাঁর প্রগতিশীল ভাবনাচিন্তাগুলি প্রকাশ করতেন।

১৯৪২-এর ২৫ এপ্রিল রাসবিহারী নিজের স্বাক্ষরেই লিখেছেন--- 'সত্যই ভগবান। Truth is God'। বস্তুত রাসবিহারী বসু ছিলেন আদ্যন্ত হিন্দু জাতীয়তায় বিশ্বাসী একজন ভারতীয় সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামী। লেখক ভূমিকাতে লিখেছেন সঠিক তথ্যের অভাবে বা জাপানি ভাষায় লিখিত হওয়ার জন্য রাসবিহারী বসুর সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। যদিও ৫৮ বছরের জীবনবৃত্তে রাসবিহারী নিজে এক মহান দ্রষ্টা, সংগঠক, যুক্তিবাদী, নেতা, লেখক, চিন্তক ও বিপ্লবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেইসঙ্গে রাসবিহারী বসুর জীবনবৃত্ত লিখতে গিয়ে তাঁর জন্মস্থান বর্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রাম এবং গ্রামের পাশে বাঘখালে সাঁতার কাটার স্মৃতি, শিক্ষক চারুচন্দ্র রায়, প্রবর্তক সঙ্ঘের মতিলাল রায়, বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, মণীন্দ্রনাথ নায়েক, জাপানে তাঁর আশ্রয়দাতা মিৎসুরু তোয়ামা, স্ত্রী তোশিকো, জাপানে তাঁর গৃহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগমন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির সঙ্গে ছবি ও লেখার মাধ্যমে তিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

পুস্তক : রাসবিহারী বোস : এ সাইক্লোনিক ফ্রিডম ফাইটার অব গ্রেটার ইস্ট-এশিয়া। প্রকাশক : রাসবিহারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট, চন্দননগর, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ। মূল্য : ৬০০ টাকা।

ভারতের পাশে দাঁড়িয়ে বেজিঙের উপর কঠোর পদক্ষেপ শ্রীলঙ্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ চীনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এবার চরম পদক্ষেপ নিল শ্রীলঙ্কা। শ্রীলঙ্কা সরকার এক বছরের জন্য চীনা গুপ্তচর জাহাজগুলিকে তাদের বন্দরে ডকিং নিষিদ্ধ করেছে। গত ১ জানুয়ারি থেকে শ্রীলঙ্কার তরফে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয়েছে। এর ফলে ভারত মহাসাগরে গুপ্তচরবৃত্তিকারী চীনের জাহাজগুলো আর শ্রীলঙ্কার বন্দরে থামতে পারবে না। শ্রীলঙ্কার এই পদক্ষেপকে ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি কূটনৈতিক জয় হিসেবে বিবেচনা করছে আন্তর্জাতিক মহল।

ভারত সরকার নানাভাবে আকারে ইঙ্গিতে শ্রীলঙ্কাকে বার্তা দিয়েছিল যে 'গবেষণার' আড়ালে চীনের এই জাহাজগুলি ভারত মহাসাগর জুড়ে গুপ্তচরবৃত্তি করছে। এদিকে ভারতের তরফে সতর্কতা জারির পর শ্রীলঙ্কা সরকার এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। শ্রীলঙ্কা বর্তমানে পাহাড়প্রমাণ ঋণে ডুবে রয়েছে চীনের কাছে। আর এরই সুযোগ নিয়ে ড্রাগনের দেশের গুপ্তচর জাহাজগুলি দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কায় নোঙর করছিল। চীনের ওপর শ্রীলঙ্কার এই নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিঙের ভূ-রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতি একটি বড়ো ধাক্কা হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে। কারণ বারবার শোনা যাচ্ছিল যে চীন বিভিন্ন কায়দায় ভারতের ওপর নজর রাখছে। যার মধ্যে অন্যতম হলো সমুদ্রের মাধ্যমে নজরদারি। ধারণা করা হচ্ছে, ভারত মহাসাগর ও মালাক্কা প্রণালীর অগভীর জলের ভেতর দিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজছে চীন। এর মধ্য দিয়ে ভারতকে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চ্যালেঞ্জ জানানোর চেষ্টা করছে চীন। শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা বন্দরকে ঋণের ফাঁদে ফেলে দখল করে নেয় চীন। চীন যখন ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে কলম্বোতে আরেকটি গুপ্তচর জাহাজ পাঠানোর পরিকল্পনা করছিল তখন শ্রীলঙ্কা এই নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চীনের এই জাহাজের নাম— জিয়াং ইয়াং হং-৩। এর আগে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমসিঙ্ঘেকে 'অনুরোধ' করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শ্রীলঙ্কার বিদেশমন্ত্রী আলি সাবরি বলেন, 'জানুয়ারি মাস থেকেই এই নিষেধাজ্ঞা শুরু হয়েছে। এটি আমাদের নিদের স্বার্থে, যাতে আমরা আমাদের সক্ষমতা বাড়াতে পারি। এর ফলে আমরা এ ধরনের গবেষণা কার্যক্রমে সমান অংশীদার হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারব'।

মালদ্বীপ সরকারের ৩ মন্ত্রী অপসৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মরিয়ম শিউনা, মালশা শরিফ এবং আবদুল্লা মাহজুম মজিদ— মালদ্বীপ সরকারের এই ৩ মন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারত ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে

আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন। মালদ্বীপ বলেছে যে এগুলি তাদের ব্যক্তিগত মতামত এবং এগুলি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন নয়। গত ৪ জানুয়ারি লাক্ষাদ্বীপ সফরে গিয়েছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে সমুদ্র ও সমুদ্রসৈকতের ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন তিনি। তারপরেই ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ছবি নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে একের পর এক কটাক্ষ শুরু করেন 'চীনপন্থী' মালদ্বীপ সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর লাক্ষাদ্বীপ সফরের ছবি দেখে মালদ্বীপের

যুবকল্যাণ মন্ত্রী মরিয়ম শিউনা ও মালদ্বীপের নেতা জাহিদ রামিজ অশালীন ভাবে কটাক্ষ ছুঁড়ে দেয় নরেন্দ্র মোদীর প্রতি।

একের পর এক অসম্মানজনক মন্তব্য সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পরে সাফাই দেয় মালদ্বীপের সরকার। বিবৃতি জারি করে বলা হয়, 'বাকস্বাধীনতা থাকলেও সেটা ভেবেচিন্তে প্রয়োগ করা উচিত। হিংসা ছড়াতে বা আন্তর্জাতিক মহলে মালদ্বীপের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠতে যেন বাকস্বাধীনতার অপব্যবহার না হয়। সোশাল মিডিয়ায় বিদেশি নেতা ও আধিকারিকদের বিরুদ্ধে নানা অপমানজনক মন্তব্য ঘোরাফেরা করছে। তবে সেগুলো প্রত্যেকটাই ব্যক্তিগত মতামত, তার সঙ্গে মালদ্বীপ সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই'।

এহেন পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যেই মালদ্বীপ সরকারের সঙ্গে কথা বলেছে সেদেশের ভারতীয় হাইকমিশন। মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে মহম্মদ মুইজু প্রশাসনের সঙ্গে তাদের আলোচনাও হয়েছে। বিতর্কের মুখে পড়ে অবমাননাকর পোস্টগুলো মুছে দেওয়া হয়েছে। তারপরেই মন্ত্রীসভা থেকে সাসপেন্ড হয় মরিয়ম সহ আরও ২ জন মন্ত্রী। উল্লেখ্য, গত বছর চীনপন্থী মুইজু ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ভারতের সঙ্গে মালদ্বীপের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। গত কয়েক দিনে অন্য মাত্রায় পৌঁছে যায় সেই দ্বন্দ্ব।

রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত বীরগতিপ্রাপ্ত করসেবক কোঠারি ভ্রাতৃদ্বয়ের বোন পূর্ণিমা কোঠারি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলনে প্রাণ বলিদানকারী করসেবক রামকুমার ও শরদ কুমার কোঠারির বোন পূর্ণিমা কোঠারি শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের তরফে আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় নবনির্মিত ভব্য রামমন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে যোগদানের নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। এই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য কলকাতা মহানগর থেকে তিনিই প্রথম নিমন্ত্রিত। গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ সন্ধ্যা ৬টায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈত চরণ দত্ত, ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় কুমার নন্দী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক জয়ন্ত রায়চৌধুরী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক প্রশান্ত ভট্ট এবং কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক সারদা প্রসাদ পাল— পূর্ণিমা কোঠারির বাসভবনে পৌঁছে ভগবান রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে যোগদানের নিমন্ত্রণপত্র তাঁর হাতে তুলে দেন। নিজের মেয়ের সঙ্গে সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হতে পারবেন জেনে তিনি বাক্‌রুদ্ধ ও অভিভূত হয়ে পড়েন। নিজের দুই দাদার বলিদান স্মরণ করে তিনি বলেন যে, ধর্ম ও সমাজ রক্ষার্থে অগণিত আত্মবলিদানকারী বীরগতিপ্রাপ্তদের স্মৃতি শ্রীরামমন্দির নির্মাণকল্পে সমর্পিত।

এই মহতী অনুষ্ঠানে পূর্ণিমা কোঠারিকে আমন্ত্রণ জানাতে ওই অধিকারীদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পশ্চিম ভাগ সঙ্ঘচালক ব্রহ্মানন্দ বংগ, পশ্চিম ভাগ কার্যবাহ তেজ বাহাদুর সিংহ, রাম-শরদ কোঠারি স্মৃতি সঙ্ঘের অধ্যক্ষ রাজেশ আগরওয়াল (লালা) এবং এই সংস্থার পরিচালন সমিতির পদাধিকারী ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। রাজেশ আগরওয়াল জানান, আগামী ১৬-২৫ জানুয়ারি অযোধ্যায় আগত রামভক্তদের জন্য চা-বিস্কুট-নিমকি ইত্যাদির ব্যবস্থা এই সংস্থার মাধ্যমে করা হবে। সেবাদানের এই সুযোগ লাভের জন্য শ্রীরামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

ফাঁসি রদ কাতারে বন্দি ৮ প্রাক্তন ভারতীয় নৌসেনা কর্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অবশেষে স্বস্তি কাতারে বন্দি ৮ প্রাক্তন ভারতীয় নৌসেনা কর্মীর। তাঁদের ফাঁসির আদেশ শোনানো হয়েছিল ২০২৩-এর অক্টোবরে। এরপর মৃত্যুদণ্ড পুনর্বিবেচনার আর্জির মামলার শুনানি শুরু হয়। অবশেষে তাঁদের ফাঁসি রদ

করেছে আদালত। তাঁদের সাজা বদলে কারাবাসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকারের তরফে বিস্তারিত রায় দেখার পর বিবৃতি জারির কথা প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছে। তবে কেন্দ্র আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে। বন্দিদের পরিবারের সদস্যরা ঠিক করবেন পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে। তবে কোন শর্তে তাঁদের সাজা কমানো হলো তা এখনও জানা যায়নি। ওই বন্দিদের বিরুদ্ধে চরবৃত্তির অভিযোগ আনা হয়েছিল। এই ফাঁসি রদকে ভারতের 'কূটনৈতিক জয়' হিসেবে দেখছে ওয়াকিবহাল মহল।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের আগস্ট মাসে ভারতীয় নৌসেনার প্রাক্তন ৮ কর্মীকে গ্রেপ্তার করে কাতারের গোয়েন্দা বিভাগ। তাঁরা সকলেই 'আল-দাহরা গ্লোবাল টেকনোলজি' নামে একটি বেসরকারি পরামর্শদাতা সংস্থায় কাজ করতেন। কাতার প্রশাসন এই সংস্থার মালিক তথা ওমানের বায়ুসেনার প্রাক্তন আধিকারিক খামিস আল আজামিকে আগেই গ্রেপ্তার করেছিল। ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু এই একই মামলায় ভারতীয় নৌসেনার এই ৮ জন প্রাক্তন আধিকারিককে আটক করা হয়েছিল। নৌসেনার একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, নিজেদের কর্মজীবনে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন ওই ৮ জন। পরে তাঁরা স্বেচ্ছাবসর নিয়ে যোগ দেন কাতারের ওই বেসরকারি সংস্থায়। সূত্র মারফত খবর, সংস্থাটি কাতারের নৌবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ করত। একাধিকবার শুনানির পরে ২০২৩-এর ২৬ অক্টোবর দুর্নীতি এবং ইজরায়েলের হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগে ৮ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয় কাতারের একটি আদালত।

প্রাক্তন নৌসেনা কর্মীদের হয়ে আইনি পদক্ষেপ করতে শুরু করে ভারত। ২০২৩-এর ডিসেম্বরে ভারতীয় প্রতিনিধিরা তাঁদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পান। আধিকারিকদের পরিবারগুলির সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রেখে গিয়েছিল ভারত সরকার। পরিবারগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। তার আগেই গত ১ ডিসেম্বর দুবাইয়ে হওয়া জলবায়ু সম্মেলন 'কপ-২৮'-এ যোগ দিয়ে কাতারের আমির— শেখ তামিম ইবন্ হামাদ আল থানি পার্শ্ববৈঠক করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে। প্রবাসী ভারতীয়দের উন্নতি নিয়েও আলোচনা হয় দু'জনের মধ্যে। বৈঠকের নির্যাস হিসেবে ভারত জানিয়েছিল যে, কাতারে বসবাসকারী ভারতীয়দের স্বাচ্ছন্দ্য বিষয়ে কথা হয়েছে দুই দেশের মধ্যে। তবে একটি সূত্র অনুযায়ী এও জানা গিয়েছিল যে, বৈঠকে ভারত ৮ জনের মৃত্যুদণ্ডের সাজা হ্রাস করার বিষয়টিও উত্থাপন করে। অবশেষে গত ২৮ ডিসেম্বর, ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ভারতের আপিল আবেদন মেনে কাতারের অ্যাপিলেট আদালত ৮ প্রাক্তন ভারতীয় নৌসেনা আধিকারিকের মৃত্যুদণ্ডের সাজা মকুব করেছে। সূত্রের খবর, ওই প্রাক্তন নৌসেনা আধিকারিকদের ৩ থেকে ২৫ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। ফাঁসির পরিবর্তে ৮ প্রাক্তন নৌসেনা আধিকারিকদের মধ্যে একজনের ২৫ বছরের কারাদণ্ড, ৪ জনের ১৫ বছরের কারাদণ্ড, ২ জনের ১০ বছরের কারাদণ্ড, একজনের ৩ বছরের কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা হয়েছে। তবে এই নিয়ে এখনও বিদেশ মন্ত্রকের তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু ঘোষণা করা হয়নি। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী জানিয়েছেন, পূর্ণাঙ্গ রায়ের প্রতিলিপি এখনও পর্যন্ত পাওয়া না যাওয়ায় নৌসেনার ৮ জন আধিকারিক কী শাস্তি পেতে চলেছেন তা বলা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক মহল ভারতের কূটনৈতিক সাফল্য দেখছে নৌসেনার ৮ প্রাক্তন আধিকারিকের মৃত্যুদণ্ডের সাজা রদ করার সিদ্ধান্তের নেপথ্যে। ভারত সম্প্রতি 'ট্রান্সফার অব সেন্টেন্সড্ পার্সন্স' (টিএসপি) শীর্ষক একটি এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে কাতার-সহ ৩১টি দেশের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, এই চুক্তি অনুসারে ২০০৬ থেকে ২০২২-এর জানুয়ারি পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট দেশগুলি থেকে ৭৫ জন জেলবন্দি ভারতীয় ভারতে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং ভারতীয় জেলে বন্দি ১১ জন বিদেশি নাগরিক সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে স্থানান্তরিত হয়েছে।